KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : কবিতাভবন 202 রাসবিহারী এভিনিউ, কল-২৯
Collection : KLMLGK	Publisher : বুদ্ধদেব বসু
Title : কবিতা (KAVITA)	Size : 5.5" x 8.5"
Vol. & Number : 21/2 21/4 22/3 22/4 23/2	Year of Publication : Dec 1956 (আষাঢ় ১৩৬৪) (চৈত্র ১৩৬৫) (আষাঢ় ১৩৬৫) ((পৌষ ১৩৬৫)
	Condition : Brittle ✓ / Good ✓
Editor : বুদ্ধদেব বসু	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

কবিতা

সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু

চৈত্র ১৩৬৪
দাম এক টাকা

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র * কলিকাতা-৭০০ ০০৯ *

কবিতা

চৈত্র, ১৩৬৫

বর্ষ ২২, সংখ্যা ৩

ক্রমিক সংখ্যা ৯৩

দুটি কবিতা

জীবনানন্দ দাশ

রজনীগন্ধা

এখন রজনীগন্ধা—প্রথম—নতুন—
একটি নক্ষত্র শুধু বিকেলের সমস্ত আকাশে ;
অন্ধকার ভালো ব'লে শান্ত পৃথিবীর
আলো নিভে আসে।

অনেক কাজের পরে এইখানে থেমে থাকা ভালো ;
রজনীগন্ধার ফুলে মৌমাছির কাছে
কেউ নেই, কিছু নেই, তবু মুখোমুখি
এক আশাতীত ফুল আছে ।

রচনাকাল : ১৩৫৪
কবি-কর্তৃক পরে ঈষৎ পরিবর্তিত

শবের পাশে

(পুরোহিতের প্রার্থনা : অসামাজিক)

মৃত ?
তবুও সে মাটি নয়।
মাথার চুল যেন আরো অনেক কাল ব্যবহার করবে সে—
তার হাতির দাঁতের মতো ধূসর কপালের উপর
ভোরের অজস্র দাঁড়কাকের মতো চুলের আনন্দ,
চুলের আবেগ : যেন মিশরের মহীয়সী শাল প'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে
লাল-নীল কাচের জানালা খুলে দিয়ে
নব-নব ভোরের রৌদ্র ও নীল আকাশকে আস্বাদ করবার জন্যে।

কোন-এক অন্ধকার লাইব্রেরির নিস্তব্ধ হলুদ পাণ্ডুলিপির মতো
দেখলাম তাকে :
শ্রাবণের রৌদ্রে রেবা নদীর মতো ছিল যে একদিন ;
সে আর ঘুমোবে না কোনোদিন,
স্বপ্ন দেখবে না ;
তার মৃত মুখের বিমর্ষ মোমের গন্ধকে ঢেকে ফেলে
শুধু তার ঘন কালো চুল
সেই আবহমান রাত্রি থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে জেগে রয়েছে
কোনো-এক দূর, ভালো দ্বীপের মতো
যেখানে জাগ্রত পাখিদের প্রেম
ধূসর সমুদ্রকে জাগাতে পারে না আর।

যে-সমুদ্রের কোনো বেলা নেই,
পাণ্ডুর দেহের নীরবতা নিয়ে তারই ভিতর নামল সে ;
জ্যামিতির ভিতর থেকে রূপ তার কুহক হারিয়ে ফেলেছে ;

তারপর বিশৃঙ্খল মাংসের দুর্বলতা নিয়ে
পৃথিবীর বড়ো-বড়ো নাবিকের বিবর্ণ ভয় ও বিস্ময়ের জিনিস সে।

এই নারী আজ নিস্তব্ধ ;
মনে হয় যেন কোন সুদূর দ্বীপে ঘুম রয়েছে শুধু :
এর দেহের ভিতর বিবর্ণ দারুচিনি-ছালের গন্ধ,
এর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হয়
কোন অসীম নির্জনতার ভিতরে উঁচু-উঁচু গাছের ধীর আলোড়ন যেন
(আরো নিস্তব্ধ)
এই মৃতার শরীরে সেই দূর দ্বীপের সবুজ শব্দ—স্বাদ—ছায়ারৌদ্রের বুনুনি—

আমলকি-গাছে কোকিল এই নিষ্পাপ স্রোত অনুভব করেছে,
তাই সে ধূসর চিন্তার সম্রাটের জন্যে সংগীত খুঁজতে চ'লে গিয়েছে :
মৃত্যুর মহান আত্মীয়তা
পৃথিবীর পাখিদের কাছেও মৈথুনের চেয়ে প্রগাঢ়।

রচনাকাল : ১৩৪৪

কবিতায় প্রাণী ও পুতুল : গটফ্রীড বেন্‌-এর স্মরণে

জ্যোতির্ময় দত্ত

জর্মানির সব-কিছুর মধ্যেই এক বর্বর অসাধারণতার স্পর্শ আছে। সে-দেশের ভূগোল ও ইতিহাসে যেমন বিপরীতের সংঘাত ও সমন্বয় ঘটেছে, মানুষের দেহে ও মনেও তেমনি এক আশ্চর্য মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। জর্মানির পূর্বদিকে অগণিত স্লাভগণ, ভাষা ও আচারে যেমন তাঁরা পৃথক, তাঁদের অধিকৃত ভূভাগের আকার ও গড়নও তেমনি পশ্চিম-ইউরোপের বিপরীত। পূর্ব-ইউরোপের বিশাল প্রান্তর জলাভূমি ও হ্রদের দ্বারা বিভক্ত। পশ্চিমের দেশগুলি ছোটো-বড়ো উপত্যকাবিশেষ; বিভিন্ন পর্বতমালার চাপে প'ড়ে ক্ষুদ্র প্রান্তরগুলি আন্দোলিত; মাঝে পলিমাটি জ'মে যতটুকু গ'ড়ে উঠেছে সেটুকুই সমতলভূমি। নাইসে ও ওডার নদী যখন জর্মানির সীমান্তে ছিলো না তখন মনে হ'তো সে-দেশের জ্যামিতিক কেন্দ্রের এক চুলও পূর্বদিকে কেউ যদি কোনো মার্বেলের গুলি রাখে, তবে তা অনায়াসে গড়িয়ে-গড়িয়ে লেনিনগ্রাদ, এমনকি বেরিং প্রণালী পর্যন্ত চ'লে যেতে পারে। দুটি ছাড়া সব বড়ো-বড়ো হ্রদ পূর্বাঞ্চলে। আর পশ্চিমে ও দক্ষিণে, হার্ৎজ ও ভোজ পর্বতমালা বিভিন্ন নদীর অববাহিকাকে বিভক্ত করে।

পশ্চিম এবং পূর্বের বিপরীত গড়ন যেমন জর্মানির ভূগোলে লক্ষ্য করা যায়, তার ইতিহাসেও তেমনি বৈপরীত্যের প্রাচুর্য বিদ্যমান। আধুনিক কালে যন্ত্রের আশ্চর্য উন্নতি যদিও ঘটেছে, মধ্যযুগীয় সমরব্যবসায়ী ভূস্বামীগণের প্রতাপ কিছুকাল আগেও প্রবল ছিলো। ধর্মবিপ্লব প্রথম ঘটে জর্মানিতে, আবার, সে-বিপ্লব সবচেয়ে আগে ফুরিয়ে যায় সেই দেশেই। অর্থাৎ, মধ্যযুগ সবচেয়ে বেশিদিন টি'কেছিলো সেই জর্মানিতে, যেখানে আধুনিকতার সূত্রপাত হয়।

জর্মানগণের জাত্যাভিমান প্রসিদ্ধ। অথচ, তাঁদের রক্তেও অসংখ্য উৎসের ধারা প্রবাহিত। উত্তরের অধিবাসীগণের আকার দীর্ঘ, নীল তাদের চোখ, চুল কটা। দক্ষিণে বাঙালির মতো কৃশ জর্মানের দেখা পাওয়া অসম্ভব নয়।

হার্ৎজ পাহাড়ের দক্ষিণে যতো যাওয়া যায়, চুল ও চোখ ততোই কালচে হ'য়ে আসে। টমাস মান্‌ উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে এই দৈহিক পার্থক্য ছাড়াও আরো অনেক কিছু লক্ষ্য করেছিলেন। গ্যেটে এবং শীলার, বেটোফেন ও হ্বাগনার দুই সুদূর লোকের অধিবাসী; টিউটন ও লাতিন, পূর্ব ও পশ্চিম, আপোলো ও ডিয়োনিসাস—বিরোধের যতোগুলি পরিচিত উপমা আছে সেগুলি তাই এতো ঘন-ঘন জর্মানির বেলায় প্রয়োগ করা হয়।

অর্থাৎ, যে-কোনো দিক থেকেই দেখা যাক, সে-দেশের অর্ধাংশ আড়ালে র'য়ে যাবে। তাই, ইতিহাসের সরলতায় জর্মানির গভীরতা ধরা পড়ে না। যেমন উঁচু-নিচু প্রান্তরের পৃষ্ঠভাগ অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমার দ্বারা নির্ণয় করা যায় না, পুরাণের সাহায্য বিনা জর্মান চৈতন্যের অন্ধকার, পাগলামি-ভরা আধখানার সঙ্গে পরিচয় হওয়া অসম্ভব।

হোল্ডার্লিনের হাইপেরিয়ন নাকি এ-রকম একটি পুরাণ, যার সাহায্যে আমরা জর্মান চৈতন্যের গোপন অংশগুলির সঙ্গে পরিচিত হ'তে পারি। এই উপন্যাসটির একটি অংশ কোথাও উদ্ধৃত দেখেছি: 'এমন এক নীরব-হ'য়ে-যাওয়া আছে যখন অন্য সব জীবন উপেক্ষিত হবে। তখন মনে হবে আমরা সব হারিয়েছি। আত্মার দীর্ঘ রাত্রি নেমে আসবে। কোনো নক্ষত্রের আলো এসে পৌঁছবে না। এমনকি ভেজা কাঠের জৌলুশও আমরা দেখতে পাবো না।...সেই চরম নেতির আবেশে আমাদেরই মনে হবে যেন শুধু শূন্যতার প্রভাবে আমরা জন্মেছি, শুধু সেই চরম নেতিই আমাদের বিশ্বাসের আশ্রয়, সমস্ত জীবনের কীর্তিস্বরূপ সেই শূন্যতাই রেখে যাবো।'

'চোখ নিভে গেছে, চোখের তারা উল্টো দিকে ঘোরানো। কোথাও অন্য কোনো মানুষ নেই, সর্বদাই শুধু আমি আছি। কানের দুয়ার বন্ধ, পেছনে—মস্তিষ্কের দিকে—তার খিড়কি খোলা। কোথাও কিছু ঘটছে না। আমি আছি।'

দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটিতে, পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, বিবৃত কালের পরিবর্তন হয়েছে। যা হোল্ডার্লিন আশঙ্কা করেছিলেন শুধু, দ্বিতীয়টিতে তা নিশ্চিত

বর্তমান। উদ্ধৃতিটি ১৯২০ সালে লেখা 'পরম গদ্য' নামক এক প্রবন্ধের অংশ। লেখক গটফ্রীড বেন্।

অংশটিতে ইন্দ্রিয়হীনতার যে-বর্ণনা আছে তা শুধু ইতিহাস নয়, প্রার্থনাও বটে। বেন্-এর নন্দনতত্ত্ব অতি সূক্ষ্ম। কাব্যের যে-রূপটি আমরা প্রত্যাশা করি, বেন্ তাকে বাতিল ক'রে দিতে চান। বেন্-এর পরবর্তী কবি হোলথুসেনের মতে কবিত্বের আর-এক নাম ইন্দ্রিয়ময়তা। বেন্-এর স্বভাব উল্টো বলা; তাই, তাঁর মতে, ইন্দ্রিয়মুক্তিই হ'লো সুরলোকে পৌঁছবার একমাত্র উপায়।

১৯৫৬ সালের হেমন্তকালে বেন্ সত্যই ইন্দ্রিয়মুক্তির লোকে চ'লে গেলেন, কিন্তু গেলেন অন্য সবাই যেভাবে যায়। তাঁর কবিতা এমন এক পরমতার সন্ধান করেছে যেখানে ঘটনা ও ঘটনার অর্থহীনতা লুপ্ত হবে, স্মৃতির ও ইন্দ্রিয়ের নির্ভরগুলি ধ্ব'সে পড়বে; কবিতা তখন কৈবল্যের সারাৎসারে নিমজ্জিত হ'য়ে, সৃষ্টির পূর্বে অনন্তশয়ান দেবতার মতো, শুধু আপনাকে ধ্যান করবে। তাঁর গদ্যে তিনি ঘোষণা করেছেন যে, শুধু কবিতায় নয়, জীবনেও এই কৈবল্যকে তিনি প্রার্থনা করেন। তাঁর মতে মানুষের সঙ্গে মানুষের সংযোগ ছিন্ন হয়েছে, মানুষ এবং পৃথিবীর মধ্যে বিচ্ছেদ এসেছে, এখন পরম নেতিবাদেই শুধু আস্থা স্থাপন করা সম্ভব; শুধু সম্ভব নয়, সেটাই উচিত বিশ্বাস।

এ-বিশ্বাস সম্ভবত ঠিক নয়। শেষ বিচারে, প্রত্যেক কবিই ইন্দ্রিয়নির্ভর, উপমাস্রষ্টিকারী এক মানুষ মাত্র। সেজন্য, কৈবল্যপ্রাপ্তি তাঁর পক্ষে অসম্ভব। হোল্ডার্লিনের সেই 'অনভিজ্ঞ, ভীত উচ্চারণের' শত্রু অসংখ্য। শঙ্কার প্রথম কারণ দেবতারা স্বয়ং। শুধু কবি নামক এই পরম শিশুই দেবতার উষ্ণ সন্নিধানে গমন করতে পারেন। কখনো যদি তাঁরা উজ্জ্বলতর হন, কিংবা কবি যদি তাঁদের কাছাকাছি এসে পড়েন তবে অনিষ্ট সম্ভব। কিন্তু বিনাশের আরো প্রশস্ত উপায় আছে। কখনো কবির মনে হ'তে পারে লব্ধ জ্ঞানের সম্পূর্ণ উৎস তাঁরই চিত্তের অন্ধকারে, মনে হ'তে পারে তিনিই ঈশ্বর—প্রতিনিধি নন; তখন দেবতারা রুষ্ট হবেন, চেতনার ও অবচেতনার স্রোত বন্ধ হ'য়ে যাবে।

অথচ, বেন্-এর কবিতার উৎস কখনো বন্ধ হয়নি। তার একটি কারণ এই যে প্রচারিত বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর আচারের কিছু বিভেদ ছিলো। বরং, একদিকে যেমন তিনি ঘটনাকে অস্বীকার করেছেন, অন্যদিকে কবিতায় জগৎকে মাত্রাতিরিক্ত প্রশ্রয় দিয়েছেন। রিলকের সঙ্গে তাঁর অনেক প্রভেদের মধ্যে এটাই সর্বপ্রধান। রিলকের চিন্তায় বস্তুরা অনন্য চরিত্রমণ্ডিত। আশবাবপত্র, ঘণ্টা, এক টুকরো সাবান (প্রায় বলা যায় 'একজন সাবান')—তাঁকে ঘিরে যা-কিছু থাকে, তা জড় পদার্থের উদ্ভট সমাবেশ নয়, তা যেন বহুজীবনের পরিচয়ে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের নিয়ে গ'ড়ে-তোলা সংসার। তাই, কবিতায় তারা প্রবেশ করে বস্তুর জড়ত্ব ঘুচিয়ে, যে-কোনো সম্পর্কে তারা বৃদ্ধি পায়, যে-কোনো উপমার নিবিড় আকারে তাদের তরল স্বাচ্ছন্দ্য ব্যাহত হয় না।

কিন্তু বেন্-এর কবিতায় বস্তুদের ভিন্নতা ঘোচে না, স্থূলত্ব তারল্যে পরিণত হয় না। তাঁর কবিতায় উপমার রসায়নের অভাব আছে। উপকরণ আছে, সংযোগ নেই। তাই, তাঁর কবিতা, মনে হয়, যেন এক সুপরিকল্পিত কিন্তু পুলকহীন তালিকামাত্র।

রিলকের কবিতায় তো বটেই, চিঠিপত্রের প্রথম মহাযুদ্ধের প্রতি উল্লেখ কতো বিরল। আধুনিক জীবনযাত্রার উপকরণগুলি কতো অল্পবারই না তাঁর কবিতায় প্রবেশ করেছে। আর বেন্-এর ব্যবহার এর ঠিক বিপরীত। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রভাব তিনি কখনো কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। কাব্যের বিষয়বস্তু নির্বাচনে তিনি ছিলেন সাময়িকতার ভৃত্য। মর্গ আর হাসপাতালের মধ্যে তাঁর বোধ জ্বলেছে—একমাত্র কারণ বোধহয় এই যে চিকিৎসা ছিলো তাঁর পেশা। গদ্যে তো বটেই, কাব্যেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত বেশি উপলক্ষ্যনির্ভর।

কোনো-কোনো মানুষকে সমকালীন ইতিহাস এমনভাবে নাড়া দেয় যে তাঁদের মনে হয় আদিকাল থেকে মানুষ যে-ভাবে বিবর্তিত হয়েছে হঠাৎ, তাঁদের কালে, সেই অনিবার্য গতির মধ্যে এক পূর্বাপরবিহীন সংকট উপস্থিত হ'লো। তাঁরা যেন মানুষ নামক নাটকের তৃতীয় অঙ্কে অভিনয় করছেন। বেন্ অনেকটা এই ধরনের মানুষ ছিলেন। ইউরোপের ক্রমাবনতি তাঁর কাছে

সহজতম সত্য ব'লে মনে হয়েছিল। তাঁর মনে হয়েছিলো যে এবারে ইউরোপ শুধু দুই-রকম মানুষের জন্ম দেবে—প্রথম, যারা বর্বর, চিত্ত- ও বিবেকহীন, পশুশক্তির দ্বারা চালিত; দ্বিতীয়, যারা অক্ষম, প্রত্যয়হীন ও প্রশ্নজর্জর। ইউরোপের শুভ মুহূর্তে এই দুই প্রকার গুণাবলির সমন্বয় ঘটেছিলো। বিশ শতকের ইউরোপীয় উদারনৈতিকতা এই সমন্বয় থেকে অপজাত, কিন্তু তার মধ্যে বুদ্ধি ও বিবেকের মাত্রাধিক্য ঘটেছে। শ্বেত জাতির মৃত্যু আসন্ন, ও ইউরোপের ধ্বংসই আয়তি, এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছনো এর পর অতি সহজ।

টমাস মান্‌ও মানুষদের সুস্থ গৃহী ও অসুস্থ শিল্পী এই দুই সম্প্রদায়ে ভাগ করেছিলেন; কিন্তু ইউরোপের ধ্বংসের কারণ সাংসারিকতার অভাব, অথবা উদারনৈতিকতার বৃদ্ধি, এমন তাঁর মনে হয়নি। সেহেতু, ইউরোপের ক্ষয়ের সম্ভাবনা তাঁকে শঙ্কিত করেছে। অপরদিকে, উদারনৈতিকতার বিস্তার বেন্‌কে পীড়িত করেছে। তাঁর মতে, বিবেক এককালে মানুষের অন্য সব প্রত্যঙ্গের মতো ছিলো। স্বাভাবিক অবস্থায় অন্ত্র, যকৃৎ অথবা স্নায়ুর মতোই হয়তো বিবেকও প্রয়োজনীয়, কিন্তু তার অধিক বৃদ্ধি ভালো নয়। স্নায়ুসর্বস্ব যারা, অথবা যাদের যকৃৎ দেহের সবটুকুর চাইতে ভারি, তারা যেমন আদর্শ মানুষ নয়, বিবেক যাদের সহজ জৈববুদ্ধিকে নাশ করেছে তারাও ঠিক সমান বিকৃত। তাই, শ্বেত জাতির আশু ধ্বংসের সম্ভাবনা তাঁকে প্রায় পুলকিত করে। যখন তিনি এ-সম্পর্কে কোনো প্রস্তাবের অবতারণা করেন তখন তাঁর লেখার ঢং বদলে যায়; যা ভবিষ্যৎবাণী ব'লে তিনি প্রচার করতে চান, তা পাঠকের মনে হয় তীব্র ইচ্ছার আবেগে কম্পিত; শুধু তখনই তাঁর লেখা যেন জীবিত হ'য়ে ওঠে।

অবশ্য, তাঁর সকল বিশ্বাসের মধ্যেই দুঃসাহসের মহত্ত্ব লক্ষ্য করা যায়। শ্বেত জাতির ধ্বংসের ভবিষ্যৎবাণী যিনি করেছিলেন, চরাচরের আড়ালে মানুষাতীত কোনো প্রেমময় শক্তির উপস্থিতি যিনি মানেননি, তাঁর চিত্তকে কোমল অথবা সুখাভিলাষী বলা চলে না। তাঁর গদ্য দার্ঢ্যগুণে অতুলনীয়। তাতে ভাষার ও বিশ্বাসের ঋজুতার এক ভিন্ন স্বাদ আছে। যাঁর রুচি একবার

বেন্‌-এর গদ্যের দ্বারা সংক্রমিত হয়েছে, সে সহজে তাঁকে অস্বীকার করতে পারবে না। তাছাড়া তিনি বৈজ্ঞানিক তথ্যকে জাদুবিদ্যা কিংবা কিমিয়া শাস্ত্রের মতো রোমহর্ষক ক'রে তুলতে পারতেন। আসলে, তাঁর পাণ্ডিত্যের মধ্যে বৈজ্ঞানিকের পরিকল্পনা ছিলো না; বরং, তাঁর মনকে পুরোনো নাবিকদের দেখা উদ্ভিদসাগরের সঙ্গে তুলনা করা চলে। যেমন সেই স্তব্ধ, উদ্ভিদঘন, নিরক্ষীয় সমুদ্রে অন্যত্রবিরল প্রাণীকুল বসবাস করে; পাহাড়ের মতো বিশাল, ও সূক্ষ্ম কারুকার্যমণ্ডিত, জাহাজের ভগ্নাবশেষ চারদিকে ছড়িয়ে থাকে,—তেমনি বিশ্বের সহস্র খুঁটিনাটি ও বিচ্ছিন্ন খবর, বহু প্রাচীন মতবাদের ভগ্ন অংশ, বিচিত্র তথ্যের দ্বারা অলংকৃত অনেক অযৌক্তিক ধারণা তাঁর মনের উষ্ণ পরিসরে এসে সমবেত হয়েছিলো। তাঁর গদ্যের সাহায্যে এই মনের রোমাঞ্চকর অন্দরলোকে প্রবেশ করা যায়। এবং এমন অভিযানে শুধু বুদ্ধিই তৃপ্ত হয় না, আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিও পুলকিত হয়। কোনো বক্তৃতা শোনাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কেউ যদি জাদুঘর ও শিল্পশালা, চিড়িয়াখানা ও বোটানিকাল গার্ডেন, বন্দর, সার্কাস এবং মেলা ঘুরিয়ে এনে হঠাৎ জানিয়ে দেয় আমাদের শিক্ষা সমাপ্ত হয়েছে তবে যেমন হয়, বেন্‌-এর প্রবন্ধপাঠেও পাঠক তেমন অভিজ্ঞতা লাভ করেন।

প্রথমে মনে হ'তে পারে এইরকম মনই কবিতার উপযুক্ত ভূমি। কিন্তু নির্বিকার সমাধিতে বাইরের ছবিকে ছায়া এবং বস্তুর বৈচিত্র্যকে বাহুল্য ব'লে বোধ হ'তে পারে। বেন্‌-এর একমাত্র উপন্যাসের নায়ক একটি ছবির সামনে দাঁড়িয়ে চিত্রিত প্রাণীটির কয়টি পা তা গোনে—এক, দুই, তিন, চার—এই সংখ্যাগুলিতে যেটুকু প্রত্যয় লাভ করে তা বর্ণের অতিরঞ্জনে পায় না, ঘ্রাণের মোহাবেশে তা হারিয়ে ফেলে।

কবিতার পক্ষে যা হানি, কবিতা সম্পর্কে তর্কের বেলায় বেন্‌ সেই বিশ্বাসকেই সবচেয়ে চতুরভাবে কাজে লাগান। বেন্‌ জগতের জঙ্গমতার মধ্যে কোনো পরম নিয়ম দেখতে পান নি। সৃষ্টির মধ্যে যা-কিছু নিয়ম, যে-কোনো সংযোগ লক্ষ্য করা যায়, তার সব কটিই বিচ্ছিন্ন, সাময়িক ও স্থানীয়। যেমন

ভিন্ন-ভিন্ন মূল্যবোধের চতুর্দিকে ভিন্ন-ভিন্ন সভ্যতা গ'ড়ে ওঠে, সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতার মধ্যে তাদের বৃদ্ধি ও ক্ষয় হয়, তেমনি বিভিন্ন সৌরসমাজ আকাশের শূন্যতার মধ্যে বর্ধিত ও বিনষ্ট হয়। এমনকি সময় বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন। সৌরলোকে যে-সময়ের আধিপত্য, অন্য কোনো সুদূর নক্ষত্রলোকে সে-সময় অর্থহীন।

এই নৈরাজ্যের মধ্যে মানুষ আজ নিরালম্ব। ঈশ্বরে বিশ্বাস ক্ষ'য়ে গেছে, সুতরাং ধর্ম আর মানুষকে আশ্বাস দিতে পারে না। অর্থনীতির দ্বারা মানচিত্রিত যে-সুবিশাল, জটিল ও ভয়াবহ অরণ্যসদৃশ জগৎ মানুষের বিস্মিত চোখের সামনে উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে, সেখানে কোথাও প্রাণীদল স্বার্থের জন্য নিষ্ঠুর, কোথাও জীবনরক্ষার্থে যূথচারী, অন্যত্র প্রকৃতির অটল নিয়মে সংগমাকাঙ্ক্ষী—এই জগতেই বা মূল্যবোধের নিশ্চয়তা কোথায়? কিন্তু কবিতায় কোনো-কিছু প্রবেশ করতে পারে উপমার প্রসাদে, দিব্য দেহান্তর লাভ ক'রে। মানুষ দুই পৃথক বস্তুর মধ্যে যে-অতল সংযোগ লক্ষ্য করে সেটুকু তার দান। সুদূর বস্তু শুধু এইভাবেই মানুষের মনের অন্যান্য আশবারের সঙ্গে মিলে যায়।

বেন্ বললেন, শুধু মানুষের সৃষ্টিতে নিয়ম আছে, সংহতির পশ্চাতে উদ্দেশ্যও আছে। শুধু তা-ই নয়, মানুষের সিদ্ধি শুধু তার সৃষ্টিতে। সৃজন-ক্ষমতাই একমাত্র মূল্য। মানুষের কাজের মধ্যে আমরা সাধারণত যে-সকল উদ্দেশ্য লক্ষ্য করি—চাকরির ফললাভ আহারে, সমাজ-জীবনের উদ্দেশ্য নিশ্চিন্ততা লাভ—তা বাহ্য ও গৌণ। কারণ আমরা বাঁচবার জন্য আহার করি, নিশ্চিন্ত হ'তে চাই; সুখাদ্য যদিও রসনার পুলকসঞ্চার করে, তবুও শুধুমাত্র ভোজের প্রত্যাশায় আমরা জীবনধারণ করি এমন বিশ্বাস করা শক্ত। আসলে, প্রতি কাজের মধ্যে মানুষ, তা যতো সূক্ষ্মভাবেই হোক, তার মনুষ্যত্বকে মুক্তি দেয়, তার ব্যক্তিত্বকে উপলব্ধি করে। জড় পদার্থ ও অন্যান্য প্রাণীরা যা-কিছু করে তা কোনো-না-কোনো প্রাকৃতিক নিয়মের প্রভাবে, শুধুমাত্র মানুষ একই অবস্থায় ভিন্ন-ভিন্ন পথ গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং যে যতো মাত্রায় অভ্যাস, সামাজিক রীতিনীতি ও প্রাকৃতিক নিয়ম সম্পর্কে সচেতন হয়, এবং তাদের দ্বারা চালিত না-হ'য়ে ইচ্ছামতো চলে, সে

ততো তীব্রভাবে মানুষ। বেন্ লক্ষ্য করলেন যে ঈশ্বর অথবা শয়তান, পরি অথবা প্রেত, অনুষ্ঠান এবং সমাজ—এই সব প্রাচীন বিশ্বাসের অন্তর্দেশ একটি পুলকে অশেষ, যদিও আকারে ক্ষুদ্র, প্রাণী উত্তপ্ত রাখে। উত্তাপের উৎস এই প্রাণী হ'লো সেই সৃষ্টিশক্তি, যা এদের প্রত্যেকটিকে কোনো-না-কোনো সময়ে জন্ম দিয়েছিলো।

মানুষের সৃষ্টিসম্ভার অশেষ। কিন্তু অধিকাংশ সৃষ্টির আড়ালে এক বাহ্য উদ্দেশ্য লক্ষ্য করা যায়। শুধুমাত্র কবিতা উদ্দেশ্যহীন, অথচ কবিতা মানুষের গভীরতম অভ্যাসের বিরোধী, তার সকল সৃষ্টির চেয়ে নতুন। ভাষার স্বভাব নয় ছন্দোবদ্ধ হওয়া, বুলি স্বভাবতই মুখে আসে। জন্মের পর থেকেই মানুষ ভাষার যে-ব্যবহার শেখে তা সৃষ্টির প্রতিবন্ধক; অথচ, কবিতার ভাষায় ও বাজারের ভাষায় এক আপতিক সাদৃশ্য নেই তা তো নয়। পৃথিবীর জড়ত্ব মানুষের সামনে যতো ফাঁদ পেতেছে, এটাই হ'লো তাদের মধ্যে সবচেয়ে চতুর ও সবচেয়ে সার্থক। কারণ, অর্থনীতি, এমনকি দর্শন ও এই প্রকার অন্যান্য সব জটিল বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করতে গেলে কিছুটা অভ্যাস ও সাধনার প্রয়োজনীয়তা যদিও সবাই স্বীকার করেন, এমন কে আছেন যিনি মনে করেন না যে, যেহেতু মাতৃক্রোড়ে তাঁরও বাক্‌স্ফূর্তি হয়েছিলো, সেহেতু কবিতার উপর তাঁর অধিকার বর্তেছে?

কবিতা (ও অন্যান্য শিল্পকর্ম) তাই মানুষের শ্রেষ্ঠ কৃত্য; মৃত ধর্মের পরিবর্তে মানুষের দেবত্বপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়। যে-পৃথিবীতে মনের লেশ নেই, যে-আদি-অন্তহীন জড়ত্বের ভার মানুষকে সতত পীড়িত করে, যে-অটল চৈতন্যহীনতা সকল প্রাণীর শত্রু, সেই জড়ত্বের উপর আমরা শুধু এইভাবেই ক্ষমতা বিস্তার করতে পারি। ঘটনা যদি মানুষের ইচ্ছামতো না চলে, যদি সৃষ্টির আগেকার সেই আদি নৈরাজ্য ঘোর হ'য়ে নেমে আসে, তবু কবিতার নিভৃতে আলো জ্বলবে, যা বিচ্ছিন্ন ছিলো তা সংযুক্ত হবে, যার মধ্যে শুধু ছিলো অচেতন পদার্থের মানুষের প্রতিকূল সমাবেশ তা চৈতন্যের সংযোগে মানবীয় হবে।

কবিতায় বস্তু চৈতন্যের রসায়নে মানবীয় হয়—এটুকু ব'লেই বেন্ ক্ষান্ত হননি। ঐ শোধনপ্রক্রিয়ার জন্য জড়ত্বে—এটা তিনি বরদাস্ত করতে পারেননি। তাঁর বিশ্বাস ছিলো যে আগামী কালের কবিতায় এমনকি বস্তুরাশির স্মৃতিটুকু থাকবে না। তাঁর মনে হয়েছে যে কবিতায় কল্পনার সারটুকু ছাড়া অন্য কিছুর স্থান থাকা উচিত নয়। আর তাই তাঁর ইচ্ছা ছিলো যে এই মুহূর্তেই চৈতন্যের সঙ্গে জড়জগতের সংযোগ লুপ্ত হোক।

এই পরম কবিতার কল্পনা আধুনিক কবিমাত্রেরই প্রিয়। আদি সাহিত্যের কলেবর ছিলো বিপুল, মানুষের সকল চিন্তাই তাতে স্থান পেতো। মহাভারতের বিশাল অরণ্যে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর উদ্ভিদ ও সমাজের উপকারী ওষধি সমানভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্রমে, কল্পনার সন্তানেরা হিশেবি বেনেতে পরিণত হ'লো। এখন তাদের প্রতিপত্তি যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, মেজাজও বদলেছে। কবিতা ও বিজ্ঞান আজ বিচ্ছিন্ন। সমাজতত্ত্বের ধূসর গোঁড়ামি কবিতার অরিদলের একগুঁয়েমি বৃদ্ধি করেছে। এর ফলে কবিতার ব্যাপ্তি যদিও হ্রাস পেয়েছে ঘনত্ব বেড়েছে। মানুষের সব প্রশ্নের জবাব আজ আর কবিতায় নিহিত নেই, তাই প্রতি কোষ তার রসে টনটনে। আধুনিক কবিতা আকারে হ্রস্ব, প্রতি ছত্রে তার অর্থের ধাতুশিলা এমনভাবে গ্রথিত যে কখনোই খননের প্রয়োজনীয়তা ফুরোবে না।

উনিশ শতকে কবিতা থেকে যেমন অন্যান্য তত্ত্ব বিচ্ছিন্ন হ'লো, বিশ শতকে কবিও তেমনি অপসৃত হলেন। শুধু সৃষ্টির মুহূর্তটি রইলো; সৃষ্টির আগে কবি কী ভাবে প্রস্তুত হচ্ছিলেন, বিবিধ উপকরণ কখন, কোথা থেকে এসে জড়ো হ'লো, বিস্ফোরণের সংঘাতে উপকরণগুলি কেন গ'লে-বেঁকে চেতন হ'য়ে গেলো,—ঐ-সবের কিছুই কবি আর বলেন না। গটফ্রীড বেন বললেন, সৃষ্টির অলৌকিক ঘটনা দেখবার জন্য, দর্শকদের সাহায্যার্থে, পুরাকালের কবিরা যে-সব রেলরাস্তা ঐ সুদূর তীর্থ পর্যন্ত গ'ড়ে তুলতেন, ভ্রমণকারীদের জন্য যে-সব টাইমটেবল, তীর্থের চতুষ্পার্শ্বের মানচিত্র, অলৌকিক ঘটনার ইতিহাস ইত্যাদির ব্যবস্থা করতেন, সে-সবই শুধু যে কবিতায় বর্জিত হবে তাই নয়, শুধুমাত্র

অলৌকিক ঘটনাটি থাকবে কিন্তু ঘটনার উপকরণ কিছু থাকবে না, পাপহরণী ক্ষমতা থাকবে স্রোতের, কিন্তু জল থাকবে না, তীর্থটির অস্তিত্ব থাকবে কিন্তু ভৌগোলিক অবস্থিতি থাকবে না। বেন্ কল্পনায় দেখলেন কবিতায় সৃষ্টি আছে, কিন্তু সৃষ্ট বস্তু নেই। বিস্ফোরণের ঘটনাটি আছে, কিন্তু আলো, শব্দ অথবা ধোঁয়া নেই। রসায়নের প্রক্রিয়াটুকু আছে, কিন্তু কোনো গন্ধ অথবা জালা নেই, শেষে কোনো তলানি প'ড়ে থাকে না। সীমাহীন শূন্যতার মধ্যে কবিতাও পরম শূন্যতায় পরিণত হ'লো।

কিন্তু শূন্যতা তো অসংখ্য শব্দের মধ্যে আরেকটি শব্দমাত্র, উচ্চারণ করা চলে, বোধ করা যায় না। যে-কবিতার অস্তিত্ব আছে, যে-কোনো কবিতা যা আমরা পড়েছি. প'ড়ে না-থাকি লেখা হয়েছে, লেখা না-হোক কেউ ভেবেছে, তার আয়তন আছে, গাঢ় চিত্রকল্প, রোমাঞ্চকর ধ্বনি ও আরো অনেক কিছু আছে। এতো না থাক, অন্তত কালের বিস্তারটুকু থাকতেই হবে। এবং, যেহেতু বেন্-এর কবিতাও বইয়ের পাতায় ছাপা অক্ষরের সমষ্টি মাত্র, তাঁর পরম কবিতাও আসলে অশুদ্ধ, জড়ত্বের ভারে জাগতিক।

বেন্ জড়বস্তুর ভয়ে ভীত ছিলেন। জড়ত্ব বহু প্রকারের। কবিতায় যে-শব্দ, যে-ছন্দ স্বভাবত আসে তা জড়বস্তুর কৌশল, অভ্যাসের ছদ্মবেশ। সুতরাং বেন্ সর্বদা সতর্ক ছিলেন, কবিতায় যেন অতর্কিত কিছু না ঘটে। কখনো তিনি প্রহরীদের নিদ্রিত হ'তে দেন নি, সচেতন প্রভুত্ব আলগা হয়নি। শব্দগুলিকে তিনি অনবরত অসম্ভব সম্পর্কে বাঁধতে চেয়েছেন, মিশ্র চিত্রকল্পকে আরো সুদূর, ধ্বনিকে আরো অযৌক্তিক, বস্তুকে আরো বিভক্ত করতে চেয়েছেন। কিন্তু তার ফল হ'লো বিপরীত। আসলে, একেবারে নতুন কিছু লেখা যায় না। প্রাচীন ছাঁদ, পুরোনো কবিতার ঢং, কবিতা পড়ার ছেলেবেলার অভ্যাস—সব ঘুরে-ঘুরে আসে। সত্যই যা নতুন তার জন্য কবি ফাঁদ পাতবার কৌশল আয়ত্ত করতে পারেন, শিকারের অপেক্ষায় সজাগ হ'য়ে ব'সে থাকবার উপযোগী মেজাজ ধীরে-ধীরে গ'ড়ে তোলেন, ঈপ্সিত মুহূর্তে এলে তা যাতে চিনতে পারেন এমন শিক্ষা তাঁর থাকা উচিত। ইচ্ছামাত্রই নতুন

কবিতা রচনা করবার ক্ষমতা কারো নেই; এমনকি মালার্মেও যে তা পারতেন না তার প্রমাণ তিনি ঐ কয়টি কবিতামাত্র রচনা করেছিলেন এবং বন্ধ্যত্বের ভয় কখনো তাঁর ঘোচেনি। যা জানা আছে তাই শুধু ইচ্ছা করা চলে। সেহেতু বিনীত কবি ছন্দ, উপমা ও মিলের আশ্রয় নেন। ছন্দ ও মিলের কাঠিন্য, এমনিতে, আধুনিক কবির কাছে খুব দামি মনে হয় না; আসলে, তিনি ঐ সমস্ত কৌশলের আশ্রয় নেন যাতে অভাবনীয় সংযোগগুলি আবিষ্কৃত হ'তে পারে, মিলের জন্য যাতে চিন্তার লক্ষ্য বদলে যায়, আর উপমা—আধুনিক কবির সেই দিব্যাস্ত্র, তাঁর কিমিয়ার সেই গোপন দ্রাবক যাতে সব-কিছু গ'লে যায়—কোনো-কোনো পরম মুহূর্তে এমন প্রশস্ত ইঙ্গিত ছড়িয়ে দেয় যা কবি ভাবতে পারেন নি, শুধু উপমার দায়ে প'ড়ে ভেবেছেন। কিন্তু গটফ্রীড বেন্ তাঁর কবিতাকে এ-সব সুযোগ গ্রহণ করতে দেন নি। তাঁর কবিতায় ছন্দ আর মিল সেই অটল নিয়ম, যার উপস্থিতি তিনি চরাচরে লক্ষ্য করেননি; উপমার সুপরিকল্পিত অভিনবত্ব তাঁর ইচ্ছার সফলতায় হিম হ'য়ে জ'মে থাকে, কবিতার গতি তাঁর চালনায় কখনোই বিপথগামী হ'তে পারে না, তাই প্রতি পদক্ষেপে আড়ষ্ট হ'য়ে থাকে।

বেন্ স্বাধীনতাকে ইচ্ছাপূর্তি ব'লে ভেবেছিলেন। কিন্তু ইচ্ছার পূরণ বহুভাবে সম্ভব হ'তে পারে। কবি মাত্রেই নতুন কবিতার অন্বেষণ করেন। সেজন্যই তিনি নিজেকে এমনভাবে প্রস্তুত করেন যাতে তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি প্রখর হয় এবং বোধে বিচিত্র অনুভূতিগুলির অন্বয় ঘটে; তিনি এমন কবিতা পাঠ করেন যাতে ভবিষ্যতের উৎকৃষ্ট কবিতা কী প্রকারের হবে তার কতকটা তিনি আঁচ করতে পারেন। কিন্তু সেই পরম আবিষ্কারটি আগে ঘটে না, রচনাটির প্রক্রিয়ার মধ্যেই আকস্মিকের সম্ভাবনা নিহিত। যিনি শুধু ইচ্ছার আক্ষরিক পূরণ চান তিনি দেখবেন যে পুনরাবৃত্তি ছাড়া তাঁর গতি নেই।

টোব্রিয়াণ্ড দ্বীপবাসীগণের মধ্যে মানুষের যে-জন্মবৃত্তান্ত প্রচলিত আছে সেই পুরাণে বেন্-এর অপরাধের এক উপমা মেলে। কথিত আছে যে

আদিমাতা পৃথিবীতে নেমে এলেন সন্তানের আকাঙ্ক্ষায়। কখনো পাহাড়ের চুড়োয়, কখনো বা প্রবালদ্বীপে সমুদ্রের উপকূলে, গভীর আলস্যে তিনি শয়ান থাকতেন। নগ্ন দেবীর গর্ভে বায়ু ও ধূলিকণা, সূর্যরশ্মি ও সমুদ্রের লবণাক্ প্রবিষ্ট হ'লো। সেই বিচিত্র বস্তুগুলির মিলনে প্রাণের ভ্রূণ গ'ড়ে উ বৎসরের পর বৎসর নতুন-নতুন প্রাণী তিনি গর্ভে ধারণ করলেন। এই প্রাণীকুলের জন্ম হ'লো। শেষে, এক চন্দ্রগ্রহণের সময় যখন তিনি এক গু শয়ানা, তখন সেই গুহার আবদ্ধ গন্ধ ও বাতাসের প্রভাবে মানুষের ভ্রূণ জন্মালো। দশম মাসে এক কন্যা ভূমিষ্ঠ হলেন। সেই কন্যার যৌবন আগত হ'লে, তাঁকে গর্ভধারণের রহস্য বুঝিয়ে দিয়ে, আদিমাতা পৃথিবী ত্যাগ করলেন। প্রথম বৎসরেই কৌতূহলী নারী সেই গুহায় প্রবেশ করলেন, এবং স্বীয় মাতা তাঁর জন্মকালে যা-যা করেছিলেন তার পুনরাবৃত্তি করলেন। বৎসরান্তে প্রথম পুরুষ জন্মালো, দ্বিতীয় মানবী নয়। আশাহত রমণী তখন মাতার মতো নির্বিচার হলেন, কিন্তু তিনি আবিষ্কার করলেন অন্য কোনো প্রাণীধারণের ক্ষমতা তাঁর লুপ্ত হয়েছে। এইভাবে সৃষ্টিপর্বের সমাপ্তি হ'লো, পুনরাবৃত্তির পালা শুরু হ'লো।

প্রাচীনেরা জানতেন যে আলস্য বিরতি নয়। যে-মানুষ কখনই অনায়াস হ'তে পারে না, ও যার সকল শ্রম এক পরিচিত অভীষ্টসিদ্ধির জন্য, সে যা চাচ্ছে তাই শুধু পাবে, এবং এর চেয়ে কঠিন অভিশাপ আর-কিছু নেই। মধ্যযুগের রাসায়নিক সোনা চেয়েছিলেন, তাঁরা তা পাননি এটা পরবর্তী মানুষের সৌভাগ্য। কিমিয়া এমন এক বিদ্যা যার মধ্যে বিষয়বুদ্ধির অথবা তাড়াহুড়োর স্থান নেই। 'আধ চামচ সাপের বিষ, নীলাচূর্ণ ও কর্পূরের সঙ্গে মিশিয়ে, অমাবস্যার রাত্রে হিরাকসে জাল দেও···' এই হ'লো সেই ফরমুলা যার ফলে আধুনিক রসায়নশাস্ত্রের জন্ম হ'লো। কলম্বস ভারত না-ভাবলে আমেরিকা যেতেন না। ঈথারের বদলে বৈজ্ঞানিকেরা মহাশূন্যজয়ে সমর্থ হলেন। আদিকন্যা ভেবেছিলেন তাঁর মাতা যা করেছিলেন তিনি আবার তা-ই করবেন। তাঁর উদ্দেশ্য সফল হ'লো কিন্তু অসীম জন্মের স্রোত গেলো

বদ্ধ হ'য়ে। তাঁর দৈব ক্ষমতা ক্ষ'য়ে গেলে তিনি মানবী হলেন। একই অপরাধে বেন্‌-এরও সৃষ্টিক্ষমতা লুপ্ত হ'লো। যে-মানুষ প্রাকাম্য ঈশিত্ব ও বশিত্ব জ্ঞা করেন, তিনি কাব্যের আসল সম্পদ—অণিমা, লঘিমা ও সাফল্য বঞ্চিত হন।

থচ কাব্যে যে-বশিত্ব চাওয়া তাঁর অন্যায় হয়েছিলো, তা স্বদেশবাসীর হৃদয়ে নি না-চেয়ে পেলেন। মহাযুদ্ধের পর জর্মানি বিভক্ত হ'লো, গর্বিত বিদেশী সেনাদল ঐহিক পরাজয়ের সংবাদ প্রচার করলো এবং নৈতিক অধঃপাতের দায়ে প্রত্যেক জর্মানকে বিড়ম্বিত করবার জন্য দেশী-বিদেশী অসংখ্য নীতিবাগীশের আবির্ভাব হ'লো। যুদ্ধে পরাজয় বহু রাষ্ট্রের ভাগ্যেই ঘটে, কিন্তু এমনভাবে বিশ্বনিন্দিত কোনো জাতি হয়নি। যখন প্রত্যেকে নিন্দা ও অভিসম্পাত করেছেন তখন জর্মানগণের আপনার বলতে শুধু একজনই ছিলেন যিনি অপর সকলের মতো আরম্ভে অল্প একটু অন্যায় করেছিলেন, মধ্যে ভুল বুঝতে পেরে, আত্মনিগ্রহে প্রায়শ্চিত্তের চেষ্টা করেন ও অন্তে সবার সঙ্গে জাতির লজ্জার ভাগী হয়েছিলেন। যখন সমুদ্রের ওপার থেকে টমাস মান্‌-এর কঠিন বিচারকের কণ্ঠ শোনা গিয়েছিল, যখন বিদেশ থেকে গেঅর্গে জানালেন যে জর্মানির সঙ্গে সংযোগ রাখবার প্রয়োজন আর তিনি বোধ করেন না, যখন গ্রোপিয়াস ও ব্রেথ্‌ট আমেরিকায় চ'লে গেলেন, তখন আর কে ছিলেন যিনি অন্তত উপস্থিতির আঁচে শীতার্ত পাপীজনদের উষ্ণতা জুগিয়েছিলেন। তাই, যদিও বেন্‌-এর গদ্যে এমন জমকালো আত্মময়তা, প্রাকৃতজনের প্রতি তাঁর অবজ্ঞা এতো সুপরিচিত, তরুণ জর্মান তাঁকে এমনকি রিলকের চেয়ে বেশি ভালোবাসে। তাঁর আচরণে জর্মানগণ সেই আত্মীয়তা অনুভব করেন যার লেশ তাঁর কবিতায় অথবা রিলকের চরিত্রে পান না। কবিতায় যিনি দৈব ক্ষমতা চেয়েছিলেন, জীবনে তিনি অন্যান্য মানুষের মতোই অসংখ্য ভুল করেছিলেন। হয়তো সেজন্যই তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত পত্রাবলি তাঁর কবিতার চাইতে অধিক পাঠক লাভ করেছে।

এমন পরিণতির সংকেত ঐ পুরাণে নিহিত আছে। অনন্ত সমুদ্রে ভাসমান

প্রবালপুঞ্জে মহাদেশের ব্যাপ্তি তো নেইই, অন্যান্য দ্বীপের স্থিতিও নেই। ঐ নারিকেল-শোভিত ভেলায় চ'ড়ে যখন আদিমাতা লোকান্তরে চ'লে গেলেন তখন কন্যা দেবীত্বের ক্ষমতাই শুধু পেলেন, সাহচর্যের উষ্ণতা পেলেন না। ঐ নিঃসঙ্গ রাজ্যে অভিষিক্ত হওয়ার তুল্য অভিজ্ঞতা শুধু আধুনিক কবি লা করেছেন। কবির অভিযান সমুদ্রযাত্রার চেয়ে বিপজ্জনক, তাঁর চৈত তরী ভেলার চেয়েও ক্ষীণ ও আন্দোলিত, ছন্দ উপমা ও মিলের অনিশ্চি হাওয়ায় তাঁর গতি। চতুর্দিকের শূন্যতা ভ'রে তোলবার জন্য তিনি যে-সব ছায়ার আকৃতি গড়েন তাদের চরিত্র কিংবা অবয়ব ঠিক মানুষের মতো নয়, তারা শুধু মানুষের উপমেয়। তারা প্রত্যেকে স্বতন্ত্র, তাদের সংখ্যা অগণ্য ও বিবর্তন অন্তহীন। যিনি এই ছায়ার সংসারে বাস করেন তাঁর অস্থিরতার শেষ নেই। যখনই শূন্যতা পীড়াদায়ক মনে হয়, অন্য কোনো মানুষ—নগ্ন নারীর উষ্ণতা, সবল পুরুষের আশ্রয় প্রয়োজনীয় মনে হয়, তখন তিনি শুধু আবার একটি ছায়ার পুতুল গড়েন, আরেকটি অতিরিক্ত কণ্ঠে শূন্যতার আর্তনাদ জাগে। সেই আদিকন্যার মতো তাঁরও দৈব ক্ষমতা অভিশাপ মাত্র। 'ফুল নেই, পাখি ডাকে না, নাম ধ'রে ভরা গলায় ডাকে না কেউ। অচেনা দেশ, অস্থায়ী ঘর, শূন্য ঘরে নিঃসম্বল প্রাণ।'—কে আছে যার কোনো-কোনো দুর্বল মুহূর্তে এই শূন্যতার দেয়ালগুলি ভেঙে ফেলতে ইচ্ছে না করে, যে দেবতার বদলে মানুষ হ'তে না চায়।

গটফ্রীড বেন্‌, ঐ আদিকন্যার মতো, এক মানবোচিত দৌর্বল্যের জন্য ঈশিত্ব থেকে বঞ্চিত হলেন। কারণ, আসলে, তাঁর কাব্যে ঐ পশুত্বের বন্দনা ও বিবেকের বিরুদ্ধাচার মনে হয় যেন দুর্বল মানুষের অজুহাত, তাঁর যুগের ও দেশের সপক্ষে আরেকটি যুক্তিসংগ্রহের চেষ্টা। তাঁর জীবন ও কাব্যের মধ্যে যে-আপতিক বৈসাদৃশ্য দেখা যায়, ক্রমশ তা এক গভীরতর সংযোগের আবরণ ব'লে প্রতিভাত হয়। আমরা আবিষ্কার করি যে তিনি নিতান্তই এক কালবদ্ধ মানুষ; যে-কঠিন বিশ্বাস তিনি প্রচার করেছেন তা আসলে নিজের সাফাই; পুরুষকারের বন্দনা ঘটনালাঞ্ছিত মানুষের ইচ্ছাহীনতার প্রমাণ।

কারণ, যে-পশুশক্তির বিস্তার তিনি লক্ষ্য করেছিলেন তা নিষ্ঠুরতার পক্ষে কোনো যুক্তি নয়। তিনি বললেন যে বিবেকবান ব্যক্তির এ-যুগে বাঁচা কঠিন; যেন বিবেকের সমর্থন শুধু কার্যকারিতায় পাওয়া যায়। তিনি বললেন, প্রকৃতি নিষ্ঠুর; যেন সে-সংবাদ নতুন, যেন, যেহেতু কোনো-কোনো প্রাণী তাদের সন্তান ভক্ষণ করে সেহেতু মানুষের নিয়মও বদল করা উচিত। জগতে যদি নিষ্ঠুরতার বৃদ্ধি ঘটে তা থেকে প্রমাণ হয় না যে এই পরিবর্তন কল্যাণকর, অথবা পশুত্বের বন্দনা মানুষের কৃত্য।

আসলে যে-একমাত্র বদল একালে হয়েছে তার নমুনা গটফ্রীড বেন্ স্বয়ং। গত যুগেও খাদ্য ও আচ্ছাদনের সন্ধানে মানুষ হয়রান হয়েছে, অপরিবর্তনীয় প্রাকৃতিক নিয়মে পৃথিবী লাটিমের মতো ঘুরেছে, অরণ্যে শ্বাপদ ও নগরে দ্বিপদ জন্তু সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে। কিন্তু যা ঘটছে তা-ই উচিত, এমন কথা কারো মনে হয়নি। একালে, এমন কি রাষ্ট্র গড়া হয় ঘটনাকে নৈতিক ব'লে স্বীকার ক'রে নিয়ে। ঘটনাকে সমর্থন করবার জন্যেই আজ চৈতন্যের প্রয়োজন; বুদ্ধি আজ কল্পতরু, যে-কোনো নিষ্ঠুরতা—জাতির ও ব্যক্তির স্বাধীনতা অপহরণ, মৃত্যুদণ্ড, সাম্রাজ্য ও মুনফা, কারাগার ও গুপ্তচর—সব-কিছুর সমর্থনেই যুক্তি থরে-থরে সাজানো। যদিও মানুষের সকল আচারই পরিবর্তনীয় (আর, সেহেতু, শোধনীয়), তবুও প্রত্যেকটির সমর্থনে অসংখ্য অজুহাত আবিষ্কার করা চলে; অবশ্যম্ভাবী, প্রাকৃতিক, সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয়—এ-রকম বিশেষণ মৃত্যুদণ্ড, বর্ণাশ্রম, বহুবিবাহ, যুদ্ধ এবং আরো অনেক এবম্বিধ আচার ও অনুষ্ঠান সম্পর্কে বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে। এক অদ্ভুত জড়বাদের প্রভাবে আমরা ভাবতে শিখেছি যে, যেমন অটল নিয়মের প্রভাবে জীবনদাত্রী জল কালক্রমে হিমধারায় ভূপৃষ্ঠ নিমগ্ন করে, এবং সময় হ'লে আবার আপনা থেকেই অপসৃত হয়, যেমন এই প্রসার ও সংকোচনের জন্য আমরা আক্ষেপ করতে পারি না, তেমনি, একদিকে, কালক্রমে সমাজের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী; অন্যদিকে, প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান কোনো-না-কোনো কালে প্রয়োজনের অমোঘ তাগিদে যুক্তিপূর্ণ।

বেন্-এর মতে মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে একটি ছাড়া অল্পই প্রভেদ আছে। মানুষেরা কখনো-কখনো কল্পনার পরিচয় দেয়; যন্ত্র, বিজ্ঞান, সমরকৌশল, পুরাণসৃষ্টি,—এই সব প্রমাণ করে যে কোনো-কোনো মুহূর্তে মানুষ পুরোনো আচার ত্যাগ ক'রে ভিন্ন উপায় গ্রহণ করে। কিন্তু, এমনিতে মানুষের ব্যবহারে বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় না। তার সামাজিক চিন্তা নিতান্তই প্রাকৃতিক। এমন কি দাসপ্রথা মানুষের আগে পিঁপড়েরা আবিষ্কার করেছে। শিল্পবিপ্লব যে চৈতন্যহীন শ্রমিকশ্রেণীর সৃষ্টি করেছে তাদের তুলনাও দক্ষিণ আমেরিকার সেই আশ্চর্য পিঁপড়েদের মধ্যে পাওয়া যায়, যারা যুদ্ধে ধৃত অপরদলীয় পিঁপড়েদের ক্ষুধা ও যৌন ক্ষমতা নাশ ক'রে দেয়, পরে সেই নিরাসক্ত বন্দীদের আহার্য গ্রহণ করতে বাধ্য করায় এবং অভাবের কালে তাদের জীবন্ত ভাঁড়ার হিশেবে ব্যবহার করে।

সুতরাং মানুষের সভ্যতাগুলি যদি একের পর এক বিকশিত ও বিনষ্ট হয়, তবে এই প্রক্রিয়াকে প্রাকৃতিক ছাড়া আর কী-ই বা বলা যেতে পারে, এবং তাদের বিনাশে আক্ষেপেরই বা কী আছে? এবং সভ্যতাগুলির ক্ষয়ের কারণ বুদ্ধির অভাব কিংবা নৈতিক পতন নয়। একটি গাছের রস বৃদ্ধি পেলে তবে পাতা সবুজ, বাকল সজল হয়; সে-গাছের ফল রসনায় তৃপ্তিকর, সে-ফলের মুকুল ঘ্রাণে মোহাবেশ সঞ্চারে সমর্থ—এই কারণে গাছের আয়ুবৃদ্ধি ঘটে না। তেমনি, বুদ্ধি ও নীতিবোধ সভ্যতার জীবনের প্রকাশ, সে-জীবনের কারণ নয়। সুতরাং সামাজিক নীতিরক্ষার্থে কড়া পাহারাওলার ব্যবস্থা ক'রে, অথবা বুদ্ধিতে শান দিয়ে, কোনো মৃতপ্রায় সভ্যতাকে বাঁচানো যায় না; মরা পাতায় সবুজ রং ঢেলে কে আর গাছকে বাঁচাতে পারে? কয়লার একটি ঢেলায় যতোটুকু তাপ তা পুড়িয়ে ফেললে ফেরৎ পাওয়া যায় না। প্রত্যেকটি সভ্যতা সৃষ্টিমুহূর্তে যেটুকু শক্তি আহরণ করেছিলো তা ফুরিয়ে গেলে রোদন ক'রে লাভ নেই। বরং পুরোনো সব নিয়ম লঙ্ঘন ক'রে সভ্যতা যদি স্বেদ ও শোণিতের সরোবরে অবগাহন করে, তবে ব্যক্তি যে-উপায়ে শিল্প সৃষ্টি করেন ঠিক সে-উপায়ে সভ্যতাও নতুন তেজ লাভ করতে পারে।

লক্ষ্য করা যাবে যে সভ্যতার এই নতুন বিজ্ঞানের আড়ালে জাদুমন্ত্রে বিশ্বাস লুকিয়ে আছে। এক দার্শনিক মতে কয়েকটি মানুষ নিয়ে গড়া একটি প্রতিষ্ঠান ৎ এক অলৌকিক মুহূর্তে ইতিহাস, প্রাকৃতিক নিয়ম, সব-কিছুর প্রতীক প্রভুতে পরিণত হয়। সমান অলৌকিক উপায়ে, বেন্-এর সমাজদর্শনে, ংস তা-ই নবজন্মের উৎসে পরিণত হয়। এবং আমরা লক্ষ্য করি যে মন বেন্-এর নতুন কবিতার খোশা ছাড়ালে সেই এক পুরোনো কবিতার আঁঠি বেরিয়ে পড়ে, তেমনি ধ্বংসের তাণ্ডবে পুরোনো স্বেচ্ছাচারই ক্ষমতাবিস্তার করে; নতুন সভ্যতা নয়—মধ্যযুগীয় চার্চ, কনস্তান্তিনোপলে ঐহিক প্রভুর কর্তৃত্ব—এই সব প্রাচীন আধারের কঠিন আঁটো বাঁধুনিতে ধরা পড়ে নৈরাজ্য। যেমন মিল, উপমা, পূর্বতন কবিদের দৃষ্টান্ত আসলে নতুন হ'তে সাহায্য করে, তেমনি পুরোনো সমাজের বিশ্বাসগুলি—অন্যায়ের প্রতি বিদ্বেষ, ব্যক্তির স্বাধীনতা, ভাষার সততা ও যুক্তির বহুত্বের উপর আস্থা—এগুলি সভ্যতার বৃদ্ধিরই সহায়ক। এগুলিকে বিসর্জন দিলে স্বেচ্ছাচারের আদিম প্রকৃতিকে শুধু মুক্তি দেওয়া হয়।

বেন্ অবশ্য শেষ জীবনে তাঁর যুক্তির নিষ্প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পেরেছিলেন। যে-কোনো মত পুরোপুরি কাজে খাটালে কেমন হয় তার উদাহরণ আমাদের শতকে বহু আছে। এবং সে-রকম একটি তুমুল দৃষ্টান্ত যে-দেশ, সে-দেশে তিনি প্রলয়তুল্য দুই দশক অতিবাহিত করেছিলেন। বেন্ দেখলেন চতুর্দিকে স্বেদ ও শোণিতের বর্ষণ শুরু হ'লো। বৃদ্ধ বেন্ সেই হত্যালীলার সপক্ষে সোচ্চার হবার দায় এড়াবার জন্য সেনাবাহিনীতে চিকিৎসকের কাজ নিলেন, এবং, কিছুকাল পরে ছাড়া পেয়ে, এমন নিঃশব্দ নির্জনতায় প্রবেশ করলেন যে সেই নতুন বেন্‌কে জর্মানগণ তুষারসমুদ্রে নিমগ্ন হিমশৈলের সঙ্গে তুলনা করেছেন। বৃদ্ধ বয়সে বেন্ ইউরোপের আত্মাকে নতুন ক'রে চিনলেন—যে-ইউরোপ সাম্রাজ্যের বিস্তার ও বিরোধিতা করেছে, মারণাস্ত্র ও পেনিসিলিন সারা পৃথিবীতে ছড়িয়েছে, বিশ্ববাসীকে রাউলাট আইন ও হেবিয়াস কর্পাস-এর আস্বাদ দিয়েছে, যন্ত্রের *সৃষ্টি* ক'রে সেই যন্ত্রকেই ভেঙেছে, নিজের পাদ্রিকে

বিদেশে পাঠিয়েছে আবার নিজের সংস্কৃতিকে অস্বীকার ক'রে দেশত্যাগী হয়েছে।

বেন্ লক্ষ্য করলেন যে তাঁর বিদ্রোহও নতুন নয়। সেই সব আ বিদ্রোহীদের দৃষ্টান্ত তাঁর মনে এলো,—পোপের শত্রু দান্তে, চার্চের মিকেল-আঞ্জেলো এবং ইস্পানি সন্ত জন, কৃপণ মধ্যবিত্তের শত্রু রেমব্রাণ্ট, পা শত্রু গইয়া, 'প্রগতি'র শত্রু বোদলেয়ার,—যাঁদের কৃপায় তিনি তাঁর নেতিবা আর-এক অর্থ খুঁজে পেলেন। 'ঐ নেতিবাদ কতো ভিন্ন প্রকারের ভূমি থেকে সংগ্রহ করেছে! ড্যুরার ধর্মে যা লাভ করলেন টলস্টয় মানুষের নীতিতে তা-ই পুষ্টি পেলেন, ভাবনায় ও অভিধায় কাণ্ট যা আহরণ করেছিলেন গ্যেটে মানুষের চরিত্রে তাই সংগ্রহ করলেন, আর বালজাক সমাজের রীতির মধ্যে আত্মার পুষ্টি খুঁজে পেলেন। তাঁদের প্রত্যেকের চৈতন্য এই নেতিবোধে আচ্ছন্ন ছিলো। কিন্তু কী অসীম যত্নে তাঁরা এই পরম শূন্যতাকে গোপন রাখতে চেয়েছেন, কতো দ্ব্যর্থক প্রশ্নের বর্ম দিয়ে ঢেকেছেন নিজেদের, বহু শতাব্দী ধ'রে শ্বেতজাতির শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিগণ এই গোপনতাকে নিজেদের দায়িত্ব ব'লে ভুল করেছিলেন (ইউরোপে শিল্প)।' বেন্-এর মনে হ'লো যে তাঁর নেতিবাদ ইহজগতের কোনো সম্রাটের গড়া শ্মশানের সমর্থন করে না, আসলে তা সৃষ্টিশক্তির প্রকারান্তর। 'অথচ তাঁরা জানতেন কোন গভীর এবং শীতল এবং শূন্য গহ্বর থেকে আত্মা তার সৃষ্টির রসদ সংগ্রহ ক'রে আনে, নেতিবোধ সেই অজৈব বস্তুর উপস্থিতির স্বীকৃতিমাত্র।' কোনো ধর্ম নয়, শক্তিমান প্রভু নয়, শুধু সৃষ্টির ঐ সব উজ্জ্বল দেবতাদের দৃষ্টান্ত তাঁকে বৃদ্ধ বয়সে সাহায্য করলো। যৌবনে তিনি অনেক পরিব্রাজনে বিত্ত খুইয়ে ফেলেছিলেন; কিন্তু কবির কী অধিকার আছে জগৎকে উদ্ধার করবার? মিল্টন কি ঈশ্বরের সাফাই গাইতে গিয়ে নিজের ক্ষতি করেননি? গ্যেটে কি সব বিপরীতের সমন্বয় খুঁজতে গিয়ে এক মহৎ কবিতার হানি করেননি? তিনি নিজের পূর্বকৃত অপরাধে লজ্জিত হলেন না; আরো বড়ো কতো মানুষ একই ভুল তো করেছেন। অবশ্য, শেষ বয়সে সময় অল্প। কিন্তু দৌড়বার কোনো

দরকার নেই। তাড়াহুড়ো করা অন্যায়—তিনি নতুন ক'রে বললেন। এখন শুধু কাজের সরোবরে স্থির হ'য়ে ডুবে থাকা। শেষ বয়সের কোনো কবিতাই প্রায় প্রকাশ করলেন না। কিন্তু মধ্যবয়সে লেখা কবিতাটি এখনই [illegible] সত্য হ'লো।

> 'A word, a gleam, a fire, a flight,
> flame-jet and darting star in sky,
> then monstrous dark resumes the night
> in empty space : the World and I.'

অবশ্য, অনেকে এখন দর্শন চায়, অপরিচিতেরা চিঠি লেখেন—তরুণ কবিরা পরামর্শ চান, কেউ-কেউ অকারণেই বিরক্ত করে। বেন্ এ-সব কমিয়ে দিলেন, কিন্তু রূঢ়ভাবে নয়, ধীরে-ধীরে। চিঠিগুলির ভাষা নরম ও সংক্ষিপ্ত; ভালোমন্দ বিচারের দায়িত্ব এককালের এই নিষ্ঠুর সমালোচক ছেড়ে দিলেন। কৌতূহলী ব্যক্তিরা, এবং যারা শুধুমাত্র একটু মজা পেতে চায়, আর তাঁকে খুঁচিয়ে কোনো উষ্ণ উক্তি বের করতে পারে না। ভক্তেরা আর প্রেরণা পায় না। কয়েকটি প্রবন্ধ যা প্রকাশিত হ'লো তাতে জগতের উল্লেখ বিশেষ নেই। এবং শেষে, তাঁর প্রায়-বিপরীত কবি মালার্মের মতো, জগৎকে সম্পূর্ণ-ভাবে পরিত্যাগ করবার ক্ষমতা তাঁর হ'লো। ভালেরী ও জয়েস-এর মৃত্যুর এগারো বছর পরে ইউরোপের 'শেষ' শিল্পীদের মধ্যে সবচেয়ে স্বেচ্ছাচারী যুবক ও পরিপূর্ণ বৃদ্ধ লোকান্তরে যেতে সমর্থ হলেন।

> 'The lively eyes that prod
> the contents of my clothes
> shuck me out of those
> and I go bare as a god.'

—মালার্মে (ম্যাকিণ্টায়ার-এর অনুবাদ)

অগ্নিপ্রাণ

মৃণালকান্তি

রৌদ্র চাই—কীটদষ্ট শিশুশাখা অবিরল নীলে,
বৃষ্টির ধারায় ধুয়ে নিতে চাই। আমার নিখিলে
বিষণ্ণ দুঃখের শীত ঝরে ; পাখি কিংবা নই প্রজাপতি,
দিন মাস বর্ষ যায়—ইটের দেয়ালে স্তব্ধ অবারিত গতি।
ঈশ্বরের আশীর্বাদ নামে : রৌদ্র ঝরে—সোনা হয় ধূলি,
দূর মাঠ মাটি ঘাস অশ্বত্থের পীত পাতাগুলি।
এইখানে বাসি অন্ধকার, ইটের ধূসর ধূ-ধূ মরু :
বিশাল তৃষ্ণার দাহ—আমি এক অভিশপ্ত তরু।
উই, ধুলো, ক্লেদকীর্ণ অন্ধকারে আছি আর নিরবধি
বিশীর্ণ আমার দেহে তীব্রবিষ বহে নীল যন্ত্রণার নদী।—
এর থেকে মুক্তি আছে, আমার আত্মায় তাই
অনির্বাণ মুক্তির বাসনা—
কী এক আশ্চর্য মন্ত্রে মাটি হয় ফুল, মেঘ হয় পাখি,
আমিও অমৃত-নভে মেলে দেবো ডানা।

চতুরঙ্গ

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

খুব বেশি দিন বাঁচবো না আমি বাঁচতে চাই না,
শস্য ফুটলে আমি নেবো তার মুগ্ধ দৃশ্য,
নিজস্ব গৃহে প্রজা বসিয়েছি, প্রায়ান্ধকার,
কিছু-কিছু নেবো কিছুদিন, বেশি বাঁচতে চাই না।

এই অপরূপ পৃথিবী সেদিকে যাবো না মিথ্যা,
বাসনা যেমন চঞ্চল তার বিশাল জানি না,
রমণী কখন প্রিয় করে, হা রে হৃদয় জানে কি,
তবু বেশি দিন বাঁচবো না আমি বাঁচতে চাই না।

শুধু যা দৃশ্য ; অন্তঃস্থল যে খোঁড়ে খুঁড়ুক,
ভাসমান নদী ভাসাও নৌকা ভাসাও নৌকা…
যৌবন যায়, চ'লে যাবো আমি, চাষা বা ডুবুরি।
খেতে সংসারে অক্ষয় বাঁচো দৃঢ় জলৌকা।

আহা বেশি দিন বাঁচবো না আমি বাঁচতে চাই না,
কে চাইবে রোদ আচিতা অনল, কে চিরবৃষ্টি ?
অনভিজ্ঞতা বাড়ায় পৃথিবী বাড়ায় শাস্তি,
প্রাচীন বয়সে দুঃখের শ্লোক গাইবো না আমি, গাইতে চাই না।

দায়

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

চোখ নেই তেমন আকাশে—
তোমাকে ছুঁয়েই সব শান্ত হ'য়ে আছে,
প্রপিতামহের কণ্ঠ আমার গলায়
সেও কি তোমায় ভালোবেসে !

যেতে হ'লে, ঢের দূরে যেতে হয়
অদ্ভুত কুঠুরি ঘর অলীক অচেনা,
নেহাৎ আলস্য নয় আমার বিনয়
বস্তুত, তুমি এক দেনা।

না হ'লে, লাফানো যেন আকাল কি পাথর জড়িয়ে
কর্কশ, করুণ মাটি রাত্রে ভিজে-ভিজে,…
কিন্তু যে-কোনো মৃত্যু স্পষ্ট বরণীয়
বিশেষত, রোমাঞ্চসিরিজে ;

দৃশ্যছবিগন্ধময় প্রণয়ীবহুল জনপদে
ভেবেছি কখন যাবো হাওয়া, কিংবা নেতার দাপটে—
কিন্তু ততোবার তুমি বাধা দাও ত্রস্ত পদে-পদে

পুরোনো চাবির রিং, হায়, বেজে ওঠে ॥

শবযাত্রার শেষে

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কেউ কি জানতো তারা
ফিরবে ? হয়তো আশা করেছিলো কেউ-কেউ :
দূরের শীর্ণ নদীতীরে যেমন ছিলো
মৃতদেহের ধ্বংসাবশেষ, থ্যাঁতলানো হাড়ের মতো বালি,
তেমনি ছিলো সারি-সারি চাকার দাগ, না শেয়াল,
না শকুন, কেউ যা মুছে নিতে পারেনি।
অন্তত তারা তো উন্মাদ, ভেবেছিলো
জয়গান গেয়ে ফিরবে।
শবযাত্রার গান
মুহ্যমান করলো পরদিনের আলোকিত উপক্রম।

আসলে, সন্ধেবেলায় যখন শীতের দাঁতালো অরণ্যে
মারাত্মক তলোয়ারের ঝঙ্কার প্রতিধ্বনি বেজেছিলো,
যখন সোনালি সমভূমি আর নীল হ্রদের উপর দিয়ে
ভীষণ সূর্য গড়িয়ে গিয়েছিলো মাতাল শকটের মতো,
দুয়ার বন্ধ ক'রে তখন অনেকে বলাবলি করেছিলো, হয়তো
তারা ফিরবে।

২
হয়তো তারা ফিরতো, কিন্তু রাগি কালো একটানা রাত্রি
এসে আলিঙ্গন করলে মৃত যোদ্ধাদের ; পুনরুত্থানের
সম্ভাবনা গেলো তলিয়ে, আর কুচকাওয়াজের দামামা
যে বাজাতে পারতো, বিধ্বস্ত গলায় সে
মুখর হ'লো বন্য বিলাপে, যা কেবল শুনলো উৎকর্ণ অন্ধকার।

উপত্যকার নিবিড় হিজল বনের উপর
জড়ো হ'লো লাল মেঘ ; গহ্বরের ভিতরে পথ গেছে পাতালে,
সেখানে থাকেন দেবতারা : চাঁদের মতো ঠাণ্ডা
উৎসারিত শোণিতধারা ব'য়ে গেলো স্তব্ধ, সকল পথ
মিশলো কালো মোহানায়।

৩
রাত্রির সোনালি শাখার নিচে নীল নক্ষত্রবৃন্দের
তরঙ্গময় আবছায়ায় স্তব্ধ অরণ্য
ঘাড়ের রোঁয়া ফুলিয়ে উঠে দাঁড়ালো
রক্তাক্ত শরীরগুলিকে অভিবাদন জানাতে, আর
নলখাগড়ার বনে এলোমেলো ঠাণ্ডা হাওয়া হানলো
বাঁশির নরম গীতময় উচ্চারণ। তপ্ত
অগ্নিশিখা প্রথমে দীর্ঘ হ'লো প্রবল বেদনায়, তারপর আঁকাবাঁকা, অ[illegible]
গোপন বাসস্থান থেকে বেরিয়ে এলো জলজ্বলে বাঘ, অরণ্যের
সোনালি-ভীষণ সুষমা।
উন্মাদ,
তারা ভেবেছিলো জয়গান গেয়ে ফিরবে।

৪
ছিন্নভিন্ন শিবিরের উপর হা-হা ব'য়ে গেলো
প্রেতের নিশ্বাসের মতো এক ঝলক হাওয়া॥

ইতিকথা

তারাপদ রায়

এক
ফিরে যাওয়া যায়।
হঠাৎ পথে নেমে, জামতলা পার হ'য়ে
এক পা ধুলো আর হাতভরা শাপলার ফুল,
তোমার দরোজায় গিয়ে দাঁড়াতে পারি।

সন্ধ্যাবেলা। রান্নাঘরের ফাঁকে কেরোসিনের কুপি জ্বলছে
হলুদমাখা হাতে আলগোছে ঘোমটা টেনে
তুমি বললে,
'কতদিন পরে এলে।'
তখন সারা উঠোন জুড়ে বাতাবির ফুল ছড়িয়ে আছে।
মাঘের স্তব্ধ হাওয়া
পুকুরের জলে জোনাকির ছায়া।

কতদিনের কত ছবি।
তবু কি ফেরা যায়॥

দুই
পুরোনো সুরের গানে মন আর ভরে না।
সাবেকি সংসারের দেয়ালে-দেয়ালে
অনেক কালের অনেক কোলাহল জ'মে রয়েছে।
রান্নাঘরের কোনায়
পেতলের গামলার নিচে ঢাকা ঠাণ্ডা ভাত।

রোঁয়া-ওঠা বুড়ো বেড়াল ঘুরছে এ-ঘর থেকে ও-ঘরে।
দিন আর রাত্রির ফাঁকে-ফাঁকে
একঘেয়েমির ক্লান্তি।
যদি পালিয়ে যাওয়া যায়।

কিন্তু ততদিনে হয়তো
অযত্নের কাঠচাঁপার ডালে আবার কুঁড়ি ধরেছে,
আর
ভিন্ন কালের গৃহবধূর মতো
লালচেলি, রঙিন শাঁখা, আলতা পায়ে
তুমি এই সাবেক দিনের উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছো॥

তিন
ফিরিয়ে এনো। আমাকে ডেকে ফিরিয়ে নিয়ো ঘরে।
কখনো যদি হারিয়ে যাই,
এ-পথ থেকে, এ-ঘর থেকে।
এই যে দিন জানলা ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে,
শালিক পাখি, কাঠবেড়ালির চলাফেরা
চিকন আলো কাঁঠালপাতার ফাঁকে।
কালকে যদি মেলার ভিড়ে হারিয়ে যাই;
ছবির মতো আমার বাড়ি
ফেরার পথ যদিই ভুলে যাই:
ফিরিয়ে এনো। ফিরিয়ে নিয়ো ডেকে॥

চার
শীতের চকিত প্রহর
চিলেকোঠার আলসেতে হেলান দিয়েই উঠে পড়ে।

দীর্ঘ, দীর্ঘতর হিজলের ছায়া,
হেমন্তের বাতাসে ধানভানার গন্ধ,
খড়ের জালায় পায়রাবধূর মানভঞ্জনের পালা।
এলোমেলো কুয়াশায়
হিম-হিম বিকেলের নীল-ছায়া।
অনেক দূরের দিনে, অনেক দূরের গ্রামে—
স্মরণের পাঁচিলে পাতা হ'য়ে দোলে
অঘ্রানের নিরুদ্দেশ কুয়াশা।

পাঁচ

একগুচ্ছ রজনীগন্ধার মতো কোমল উজ্জ্বল
আমার যৌবনের এই দিনগুলি
আমি তোমাকে হাত ভ'রে দিতে পারি।
ছাখো কী আশ্চর্য
পুরোনো দিঘির শ্যাওলা-জমা জলে
স্পর্ধিতগ্রীবা মরালের মতো আমার যৌবন
অনায়াস ভেসে চলেছে,
ছাখো আকাশ তার সুদূরতার পর্দা ছিঁড়ে
সোনার মুকুট প'রে আঙিনায় এসে দাঁড়ালো।

বাসনার রঙে উজ্জ্বল এই আমার দিনগুলি
তোমাকে দিতে পারি,
তোমাকে সাজাতে পারি এই দিনগুলোয়।
কেবল অনেকদিন পরে আরেক দিন
মৃত্যুর শুদ্ধ শুভ্রতায়
তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিয়ো
বাসি রজনীগন্ধার করুণ ভালোবাসা
আমার যৌবনের এই দিনগুলি ॥

আলো-শরীর

গোবিন্দ মুখোপাধ্যা[illegible]

আমারই দেহের ছায়া, কোন আলোয় দীর্ঘতর হয়?
পাশেই রয়েছো তুমি ; যতো কাছে ততোই নির্ভয়
ছায়ার মানুষ আমি। বিস্মিত প্রদীপ নিয়ে হাতে
কাছে যাই, প্রপাতের গান শুনি দৃশ্যের পশ্চাতে,

মনে হয়। তুমি নও, অন্য কেউ শরীরের ঋণ
শোধ ক'রে দিতে আসে। সকালে দুপুরে প্রতিদিন
টিকটিকি-হৃদয় থাকে দেয়ালের শূন্যে ঝুলে একা ;
যে-আলোতে ছায়া দীর্ঘ হয় সেই আলোকের দেখা

সন্ধ্যায় কখন পাবে? প্রতিটি মুহূর্তে বেড়ে ক'মে
অর্ধনারীশ্বর ছায়া তৃপ্ত হবে পার্থিব নিয়মে।
ছায়ার অরণ্য আমি, আলোর শরীরে তুমি দূর
নক্ষত্রের গান আনো ; সকালে হারায় তার সুর ;

ক্রমে ছায়া হ্রস্ব হয়, আমি নিঃস্ব হই একেবারে ;
পিপাসার্ত, হিংস্র স্নায়ু ভেঙে পড়ে অব্যক্ত চিৎকারে।

দুটি কবিতা

শোভন সোম

এক

জল ছুঁয়ে হাওয়া ওল্টালো পদ্ম পাতা
সব পদ্ম ম্লান হ'য়ে রইলো একটি পদ্ম
ঢেউ ভেঙে-ভেঙে বৃত্ত থেকে বৃত্ত আঁকলো
—তুমি যখন নাইতে নামলে ॥

দুই

এক ফোঁটা—দু ফোঁটা—বৃষ্টির দুরন্ত ফোঁটায় জল কেঁপে উঠলো
টিপটিপ নূপুরধ্বনি কিশোর সবুজ পাতায়-পাতায়
কণা-কণা মুক্তোর মতো হাওয়ার দু হাতে বৃষ্টির ফোঁটা

একটি—দুটি—ভালোবাসার মুহূর্ত আমার বুক ভ'রে দিলো
বৃষ্টির দুরন্ত ফোঁটার মতো ॥

দুটি কবিতা

দেবতোষ বসু

শূন্যতা

অদূরে ভূমিষ্ঠ রাত্রি, মহাশূন্যে তারকা স্বর্গত
মর্তছবি ক্রমে অবসান ;
সুরজ মুরলী স্থির, নীলিমার বুকে তন্দ্রাহত
শব্দহীন সে-গীতবিতান।

অথচ এখনো পাশে শুয়ে আছে ঘনিষ্ঠ আবেগ
নশ্বরতা শুদ্ধ এ-প্রহরে।
গত যা নিমিত্ত মাত্র ; বর্তমানে অন্ধ কালো মেঘ
মৃত্যু ডাকে চতুর্ভুজ ঘরে।

প্রসিদ্ধ স্মৃতির দেশে সুসংগত এখন প্রস্থান—
দ্বারে মূর্ত অতনু মরণ।
একাকী ঘূর্ণিত বিশ্ব, কক্ষপথে আমি ধাবমান
সহযাত্রী শুধু মৃত মন।

পূর্বাভাস

মধ্যদিনে নিরুদ্দেশ মেঘে
ছেয়ে গেলো দৃশ্য ত্রিভুবন।
শুরু হ'লো দুরন্ত আবেগে
তুষারের বাষ্পীয় ভবন।

কম্পমান মাটির সন্ত্রাসে
ঝোড়ো দিনে সাক্ষী মহীরুহ—
তারো উর্ধ্বে ভূমধ্য আকাশে
মেঘাবর্ত রচে চক্রব্যূহ।

এইবার বৃষ্টি শুরু হবে—
শুব্ধ মেঘ, জলভারানত।
আমি ঋদ্ধ ছায়ার বৈভবে
অন্তরীক্ষে সে তড়িতাহত।

স্মৃতি ও সে

পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য

গেরুয়া বিকেলে ক্লান্ত হাটুরের মতো
তারা আসে চিন্তার ধূসর রাস্তা ধ'রে;
শৌখিন, সুভদ্র মুখ থেকে রং চ'টে গিয়ে তারা
অধুনা জলের মতো বর্ণহীন, ধরা-পায়ে আসে :
সারি-সারি ছায়া।

মুচুকুন্দ-চাঁপার গা ঘেঁষে নিচে নীল হ্রদে
শালুকের সংক্ষিপ্ত পাড়ায় ঘুরতো জল-ঢোঁড়া,
সে কখন রোদে জলে ম'জে প'চে গেছে,
নরম শরীর তার বলের মতন লুফে নেবে
খেলোয়াড় কাক, চিল অথবা শকুন :

অত্যন্ত সহজ এই প্রতিপাদ্য। তবু সমাধানে
সন্তুষ্ট হয় না কেউ : না তুমি, না তারা।
অথচ সুস্পষ্ট কোনো প্রশ্ন নেই, নেই প্রতিবাদ।
শুধু আসে চিন্তার ধূসর রাস্তা ধ'রে, তুমি দেখো,
আঁকাবাঁকা সারি-সারি ছায়া—
জলের মতোই বর্ণহীন।

সমুদ্রের তলদেশে বারুণী কন্যার নাচঘরে
স্ফটিক স্তম্ভের মধ্যে লাল, নীল, সবুজ আলোর
মশগুল মজলিশ। কোনো তীব্র ঘূর্ণি, ভূকম্পে কাঁপে না,
দোলে না, ভাঙে না কিছু। হঠকারী অবাধ্য বাতাস
ভুল বুঝে মাথা-নিচু ফিরে যায়। ছায়াও পড়ে না।

সকাল : কুমারহট্ট

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

বহুদিন পরে এখানে কে এলো ?
সকাল বললো—শুভদিন ভেল ;
প্রতীক্ষা ক'রে আছে বুঝি এক অমূল্য অর্জন।
সূর্যের হাত পড়েনি বাগানে—আবছায়া নির্জন।
হলুদ ঠোঁটের শালিকেরা চরে পুকুরপাড়ের ঘাসে—
তৃণ খুঁটে-খুঁটে কী যে খুঁজে পেলো ?
তারাও বললো—শুভদিন ভেল !
জল-ছলছল ঠাকুর-দিঘিতে আকাশের ছায়া ভাসে—
উড়ো-উড়ো শাদা মেঘের আড়ালে সকালবেলার চাঁদ
যাই-যাই ক'রে তবুও যায় না উপভোগ করে কুড়েমির আস্বাদ।
ঝরা পাতা যত ঝাঁট দিয়ে-দিয়ে জড়ো করে দেখি মালি,
আনমনা চোখ চেয়ে থাকে আর মন হ'য়ে যায় খালি।
আড়ালের ঐ গাবগাছটায় ভাঙা পাঁচিলের পাশে
কোঁচানো ডুরেটি ঝুলিয়ে রেখে কে সোজা ঘাটে চ'লে আসে ?
গোরোচনা গোরী নবীনা কিশোরী কে ধনী মাজিছে গা,
হালিশহরের পুরোনো ভিটের ভাঙা ও-জানালাটা।
মো-যদি-সিনাই-আগিলা-ঘাটে-আর-ঘাটে-পিয়া-নায়
এমনি একটি দিঘির সকাল জানালায় ডেকে যায়।

দুটি কবিতা

নবনীতা দেব

মিথ্যে

আমি জিজ্ঞেস করলুম, আয়না তুমি কার, পারুল তুমি কার, ইচ্ছে তুমি কার। ওরা বললে, কেন, তোমার। আমি বললুম, কক্‌খনও না। ওরা হাসলো।

আবার বললুম, আয়না তুমি কার, পারুল তুমি কার, ইচ্ছে তুমি কার। ওরা বললে, শুধু তোমার। আমি বললুম, বিশ্বাস করি না। ওরা কাঁদলো।

যেদিন ডাকলুম, আয়না তুমি আমার, পারুল তুমি আমার, ইচ্ছে তুমি আমার,—সেদিন রুপোলি ঝড় গোঁ-গোঁ ক'রে রেগে বললে, মিথ্যে কথা। আমি বললুম, না, না—ঝড় বললে, মিথ্যে কথা। আমি কাঁদলুম, আমার, আমার। ওরা সাড়া দিলে না।

রুপোলি ঝড় হা-হা ক'রে হেসে ব'লে গেলো, মিথ্যাবাদী॥

দ্বন্দ্ব

একবার আমার দিকে চোখ তুলে তাকাও
আমি তোমার চোখের মধ্যে একটু হাসি।
সে-হাসির আদরে তোমার চোখ কাঁপুক
তোমার চোখ কাঁপুক
তোমার চোখ লাজুক
আমি কাঁপি, আমি কাঁদি, আমি দাঁড়াই।
তোমারই মতো একা, ব্যাপ্ত,
সহস্রাক্ষ, সহস্রবাহু,
অনাদি, অনন্ত, অজর
নিজের অস্তিত্ব নিয়ে অনুক্ষণ লীলায়িত
আমি
তোমার আশ্চর্য অনিবার্য সঙ্গী।

ওপরে ফাঁকা নিচে ফাঁকা সামনে ফাঁকা পিছনে ফাঁকা
সময় যখন আপনি ফাঁকি দেয়
সেই তো ইচ্ছার লগ্ন।
আমি এসেছি, তুমিও এইবার এগিয়ে আসবে
রাগ কোরো না ত্যাগ কোরো না আশা কোরো না, শুধু তাকাও
আমার নির্মল আকাশে তোমার সোনালি রোদ্দুর
ভয় কোরো না জয় কোরো না ছল কোরো না, শুধু তাকাও
তোমারই মতো উজ্জ্বল আর নিষ্ঠুর, দর্পিত আর মায়াবী,
পবিত্র আর করুণ আঁখির অরণ্যে
শ্রাবণের বৃষ্টির মতো তাকাও
ভৈরবী স্বপ্নের মতো
বৈরাগী মৃত্যুর মতো
নিশ্চিত
আর মনে করো তুমি আমার জন্যে
বৃষ্টি আমার জন্যে, বকুল আমার জন্যে, শস্য আমার জন্যে
মনে করো, দুঃস্বপ্ন আমার, নৈবেদ্য আমার, চৈতন্য আমার
আর তখন আমি তোমার হই, তখন
আমি তোমার হই
তুমি
আমার কোলের শিশু হ'য়ে আমাকে বরণ করো
আমাকে হরণ করো
পূরণ করো ॥

রুক্মিণী বাঈ

সন্দীপ সরকার

তুমি কি কখনো শুনেছো
হারমনিআম? অবশ্যই শুনেছো।
শাদা কালো রীডের ওপর
হাতের সুন্দর আঙুল চালিয়ে
তুমি ব্যাকুল গলায় আকুল করেছো
আমায়। কতবার…ক-ত-বা-র।

কিন্তু ওই পর্যন্ত।
আজ যে-কাহিনী বলবো,
তা অন্য ধরনের।

গিয়েছিলাম কুখ্যাত গলির মধ্যে
রুক্মিণীর ওখানে। সে আমায় গান শোনালো
ভাঙা হারমোনিআমে। তবু তারই মধ্যে
শুনলাম মানবাত্মার যন্ত্রণা। সে পারেনি ইলেক্‌ট্রিক-বিল
শোধ করতে, তাই
মোমবাতি জ্বেলেছে। তারই আলোয় কাঁচুলি-বাঁধা
চালশে রুক্মিণীকে যেন প্রেতিনী মনে হচ্ছে।
গজল-ঘেঁষা স্বরে সে বারবার গাইছে,
'সারে দুনিয়া ঘুম আয়ি
তাবিভি পেয়ার না মিলি…'

আমি সারা বিশ্বে ঘুরেছি অনেক,
তবুও ভালোবাসা পাইনি…
গাইছে রুক্মিণী বাঈ, সে-গলা নেই,
যে-গলা শুনতে

একদিন ভক্তের নিত্য আনাগোনা ছিলো।
সে-দেহ নেই।
হারমনিআম পর্যন্ত বেসুরো হয়েছে।
তবলচিও নেই, তাই বোধ হয় বৃষ্টি
সঙ্গত ক'রে চলেছে টিনের চালে।
তবু মনে হ'লো এমন গান শুনিনি
কখনো।

আধো আলোয় আধো অন্ধকারে
দেয়ালে কাঁপছে রুক্‌মিণীর ছায়া,
মনে হ'লো এমনিভাবে একাকীত্বের বাঁধন ভাঙতে না-পেরে
কাঁপছে, হ্যাঁ, কাঁপছে, কাঁপছে রুক্‌মিণী নিজে।

সমালোচনা

শোহিনী : সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত। আনন্দ পাবলিশার্স। দু টাকা
মনঝাউ : বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স। দু টাকা
নাবী ফসল : সুনীল চট্টোপাধ্যায়।
অমল দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত। দু টাকা
একা এবং কয়েকজন : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। সাহিত্যপ্রকাশক।
দু টাকা
অন্তর্গতি : পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য। শতভিষা। দেড় টাকা

একজনের কবিতা থেকে অন্যের কবিতা আলাদা ক'রে চেনা যায় না—এ-রকম যে-অভিযোগ সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা সম্পর্কে প্রচলিত আছে, এই পাঁচটি কবিতার বই তার প্রতিবাদ করবে। আমার এই উক্তির উদ্দেশ্য নিছক প্রশংসা নয়, কেননা কবিতাগুলো নিজেরা ভালো না-হ'লে, শুধুমাত্র পারস্পরিক পার্থক্য নিশ্চয়ই তাদের সুনামের সাহায্য করবে না। এবং, পরস্পরের সঙ্গে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, রবীন্দ্রনাথের পর যে চার-পাঁচজন জ্যেষ্ঠ কবির কথা আধুনিক বাংলা কবিতার প্রসঙ্গে এক নিশ্বাসে উচ্চারণ করা হয়, তাঁদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব, এমনকি স্পষ্ট অনুকরণ পর্যন্ত, এঁদের কবিতায় অনায়াসে চোখে পড়ে। তাছাড়া, শব্দব্যবহারের ধারণায় এই পাচজন কবি এমন কোনো মৌলিক পার্থক্য ঘটান নি, যাতে এঁদের কাব্যচর্চা কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত হ'তে পারে। তৎসত্ত্বেও, এঁদের কবিতা প'ড়ে মনে হ'লো যে, ধীরে-ধীরে, প্রায় চোখে-না-পড়বার মতো আস্তে, বাংলা কবিতার বিবর্তনকে এঁরা নিঃসন্দেহে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন, এমন একটা-কিছু এঁরা করেছেন বা করছেন, যাতে অন্তত ন্যূনতম একটি সুরুচির দাবি আগামী যে-কোনো কবিযশঃপ্রার্থীর কাছে নির্দিষ্ট হ'য়ে রইলো।

সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্তের 'শোহিনী'তে, অবশ্য, সাম্প্রতিক কবিতার লক্ষণ কমই মেলে। এমনকি, কলাকৌশলের যে-প্রচলিত চরিত্রটি প্রায় হাতের

কাছে পাওয়া যায়, তারই একটি সধর্মী সংস্করণ ছাড়া, সমকাল বা সমকালীন বাংলা কবিতার সঙ্গে তাঁর কবিতার সম্পর্ক খুব স্পষ্ট নয়। তাঁর কবিতায় দার্শনিকতার আভাস আছে, স্নিগ্ধ নির্লিপ্ততা আছে, কিন্তু তাঁর কাব্যাদর্শ উচ্চাকাঙ্ক্ষী নয়। কোনো-কোনো সুন্দর মুহূর্তে আমাদের মন উদ্দীপ্ত হয়, প্রবুদ্ধ হয়, এবং, হয়তো বা, অনন্তের সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট হয়—এটুকু ছাড়া তাঁর বক্তব্য নেই। এবং এ-কথা তিনি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে লেখেন নি, এবং অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশে কিংবা নির্মল কোনো মুহূর্তে, কারো মানসিক অবস্থা বোঝাতে তিনি যে-সব কবিতা রচনা করেন, তাদের নাম, 'সবুজ চেতনা, 'চেতনা: পলাশ', ও 'চেতনা-দীপ'। এই কবিতা তিনটি তিনি পর-পর রেখেছেন বইতে, এবং তিনটিতেই 'চেতনা' শব্দটির ছড়াছড়ি। অথচ, ঐ শব্দটিকে বর্জন ক'রেও কবিতা তিনটির উদ্দেশ্য সফল হ'তে পারতো; হ'লে, কবিতাগুলো যে আরো ভালো হ'তো, তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই!

পূর্বোক্ত কবির তুলনায় বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক বেশি সমকালীন। দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, অবিশ্বাস, আত্মবিশ্লেষণ,—সাম্প্রতিক জীবনের অনেক লক্ষণই তাঁর কবিতা স্পর্শ ক'রে গেছে। কিন্তু এঁর কবিতায় নিপুণ ও অক্ষম পংক্তি পাশাপাশি স্থান পেয়ে থাকে। যেমন, "দেয়ালের ছবিগুলি দূর দেশ থেকে। আমাকে আশ্চর্য হ'য়ে দেখে—(আকাশ-প্রদীপ)"—ভালো, কিন্তু তার দু-লাইন পরেই "অনেক প্রাচীন সুর ব'য়ে-ব'য়ে আজ। মহাকাশে বুঝি হায় নেই কোনো কাজ"! (বিস্ময়-চিহ্নটি আমার।) বইয়ের প্রথম কবিতাটিতে "রবিঠাকুর, পেঙ্গুইন, আর। রাজনৈতিক ইস্তাহার।—বাজার ভরতি দেনা। (খোলা ঘর)"—কবির একটি বিশেষ মেজাজ পাওয়া যায়, কিন্তু তার পরের কবিতাটিতেই চোখে পড়ে "সুপ্ত অভিস্যন্দে সে-ও অতল অধরা।"

'শাল ফুল' এবং 'সাঁওতালি সুর' কবিতা দুটির ভূমিকা হিশেবে কিছুটা ক'রে গদ্য লেখা আছে। এই গদ্যাংশের তাৎপর্য আমি বুঝতে পারি নি—শালফুল এবং সাঁওতালি সুর কবির পরিচয়পত্র ছাড়াও আমাদের কাছে খুব অজানা থাকতো ব'লে মনে হয় না। বইটির অনেক কবিতাতেই, যেমন

'বর্ষার পাখি', 'বক' কি 'পথ-চাওয়া দিনের কবিতা'—লেখকের সহজ কবিত্বের পরিচয় পেলাম।

কিন্তু 'মনঝাউ' নামটিকে কি এখন আর কবিত্বময়ও বলা যাবে?

'নাবী ফসলে'র কবিতার ত্রুটিবিচ্যুতি পাতা ওল্টালেই চোখে পড়ে, কিন্তু তা ছাড়াও যা চোখে পড়ে, তা হচ্ছে একটি স্পর্শসহ, তপ্ত পদার্থ, যার সঠিক সংজ্ঞার্থ হয়তো দেয়া চলে না, কিন্তু কবিতার পক্ষে যাকে একটি গুণ ব'লে চেনা যায়। 'কথা দিয়ে কিছু ছোঁয়ার প্রয়াস করি'—তাঁর কবিতায় এই উক্তিটি এই সূত্রে তাৎপর্যময়। প্রথমত, তাঁর অধিকাংশ কবিতায় একটি শরীরিণী নায়িকার দেখা পাওয়া যায়; দ্বিতীয়ত, তিনি কখনোই নায়িকার অঙ্গবর্ণনায় তাঁর কবিতা শেষ করেন না--চিত্রকল্পের সাহায্যে একটি নির্বেদে পৌঁছতে চেষ্টা করেন। আমার বক্তব্যের সপক্ষে কবিতাংশ:

'আসবেই ভেসে সেই দ্বীপ;
খোঁপা ভেঙে ঢেলে দাও চুল;
বুক-পোড়া ধোঁয়ানো প্রদীপ
ফেলে দিই; তিথি অনুকূল।' (তিথিসম্পাত)

'ফিরে আসি তোমার আলোকে,
হই ধাতুমূর্তি-উপাসক।
তুমি এসো, আমাকে বাঁচাও।
এই অব্যবহিত পলকে
তোমাকেই জানি নিয়ামক;
সব যাক; তুমি ফিরে চাও!' (পৌত্তলিক)

লক্ষণীয়, তিনি শব্দব্যবহারে সাবধানী নন, কিন্তু একে অনবধানতা না-ব'লে অব্যবস্থিতচিত্ততা বলা উচিত—যা মাঝে-মাঝে অত্যন্ত পীড়াদায়ক ব'লে মনে হয়। 'তৃষ্ণা বা'র সঙ্গে 'আভা'র মিল, 'চৈত্রের ঝুমঝুমি', কিংবা 'যোনিমূলের' বিশেষণ হিসেবে 'মাইক-ফাটানো'—এই সবই কাব্যরুচির বিরুদ্ধে

সাক্ষ্য দেয়। 'হেবজ্র' 'ডোমিনি' প্রভৃতি তান্ত্রিক শব্দ তাঁর কবিতাকে সাহায্য করেনি, চেষ্টাকে প্রকট ক'রে তুলেছে। গদ্যে লেখা যে-দুটি দীর্ঘ কবিতা ('শীতের আঙুল' ও 'পিছল সুর') আছে 'নারী ফসলে', তাতে ভালো লাগবার উপকরণ, নিঃসন্দেহে, ছড়িয়ে আছে, কিন্তু অসুবিধে এই যে গদ্যটি কখনোই নির্ভার ও স্বচ্ছন্দ হ'য়ে উঠতে পারে নি—সর্বদাই বক্তব্যের ভারে নুয়ে পড়েছে। তবু, 'ঘরণী' 'হৃদয়ের প্রতি' প্রভৃতি কোনো-কোনো কবিতায় উপায় এবং উপকরণের ঈপ্সিত সামঞ্জস্য ঘটেছে ব'লে এই লেখকের ভবিষ্যৎ বিষয়ে আশান্বিত হওয়া যায়।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতার বইটি নানা দিক দিয়ে তৃপ্তিকর। নতুনভাবে লেখবার কোনো প্রচেষ্টা নেই তাঁর কবিতায়, অথচ তাতে নতুনত্বের স্বাদ মেলে। তার কারণ, আমার মনে হয়, পূর্বসূরীর শব্দের ধারণার তিনি সদ্ব্যবহার করেন; নতুন কোনো শব্দচেতনার জন্ম দেয় না তাঁর কবিতা, অথচ পুরোনো শব্দধারণাকে তিনি সুদে না-খাটিয়ে ব্যবহার করেন না। তিনি সেতু বেঁধে-বেঁধে অগ্রসর হ'তে জানেন, এবং তাঁর কবিতায় যে-গুণটি প্রথমেই চোখে পড়ে, তা হচ্ছে সংযম এবং শৃঙ্খলা। তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু প্রেম, এবং প্রেমের নানাবিধ অনুষঙ্গ; এই প্রেম যৌবনের, সবল এবং সফল যৌবনের, কখনো বা চতুর নায়কের, যে-অংশে বিরহ ও বিচ্ছেদ, তাকেও খুব নৈরাশ্যজনক ব'লে মনে হয় না। তাঁর কবিতা নায়িকানির্ভর। একটি উদাহরণ:—

'কিছু উপমার ফুল নিতে হবে নিরুপমা দেবী
যদিও নামের মধ্যে রেখেছেন আসল উপমা,
ক্ষণিক প্রশ্রয়-তুষ্টি চায় আজ সামান্য এ কবি
রবীন্দ্রনাথেরও আপনি চপলতা করেছেন ক্ষমা।'

('চতুরের ভূমিকা')

এবং নায়িকা অন্তর্হিত হয়েছেন যেখানে, যেমন 'উপলব্ধি' কিংবা 'দুই হৃদয়' কবিতায়, সেখানেই কবিতার ভাগ্য স্পষ্টত বিপর্যস্ত হয়েছে। 'বিবৃতি', 'মঞ্চ' প্রভৃতি কবিতায় পরীক্ষানির্ভর নতুনত্বের আভাস আছে—কিন্তু, হসন্ত-শব্দের

আধিক্য ছাড়া, নতুন হিশেবে যেটা সর্বাগ্রে চোখে পড়ে, তা হচ্ছে এই কবিতা দুটির ভিতরকার গল্পটা। কবিতা দুটির উচ্চাকাঙ্ক্ষা, বস্তুত, ঐ গল্পাংশ দুটির উচ্চাকাঙ্ক্ষা। কিন্তু, আরেকটি কবিতা—যেখানে গল্পের একটা আভাস আছে, কিন্তু গল্পটা কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছে মাত্র, এবং একটি নাটকীয়তায় নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে আছে, যে-অংশটুকুকে কখনোই কবিতা থেকে ছেঁকে নিয়ে আলোচনা করা যাবে না—সেটি আমাদের অনেক বেশি ভালো লাগে। কবিতাটির নাম 'মিনতি'। এই কবিতাটিকে আমি সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার একটি মূল্যবান সংযোজন ব'লে মনে করি।

যাকে দুর্বল বা শিথিল পংক্তি বলা যায়, পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্যের 'অন্তর্গতি'তে তা তিনটি কি চারটির বেশি নেই। [যেমন 'বৃথা বাপুজীর বাণী জ্বালো মণিদীপা।' ('পোড়ামাটি'), 'বধ্যভূমির ডাক পড়লেই যেতে হবে তাকে চট ক'রেই', ('যাজ্ঞসেনী')]। রূপরেখার সুন্দর ছবি ফোটাতে তিনি সিদ্ধহস্ত, বুদ্ধিদীপ্ত উপমার সংখ্যা তাঁর কবিতায় কম নয়, এবং 'অন্তর্গতি'তে একটিও অপাঠ্য কবিতা নেই, তৎসত্ত্বেও, যে-বস্তুটির অভাববোধ তাঁর কবিতাপাঠে অধিকাংশ সময়েই থেকে যায়, তাকে স্বকীয়তা ছাড়া অন্য কিছু বলা যায় না। 'মরীয়া বৃষ্টি' 'রাত্রে রূপকল্পে' প্রভৃতি শব্দব্যবহারেই নয়, শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দে-কে উৎসর্গ ক'রে তিনি যে দীর্ঘ কবিতা রচনা করেছেন, সেই 'সূর্যমুখীর' বিষ্ণু দে-র কাব্যভঙ্গিকে সর্বদাই স্মরণ করিয়ে দেয়। 'অকালবোধন' কবিতাটিও। অন্যদিকে, 'কয়েকটি মুহূর্তে'র তিন নম্বরটির 'দুঃখশোকের ছায়াছবি সারা স্টেশন। নীল আলোয় সংকেতিত। ট্রেনের চাকা। রুমাল ওড়ে'—এই ছবি অমিয় চক্রবর্তীর চিত্রবর্ণনারীতিকে নিশ্চয়ই স্মরণ করিয়ে দেবে। এবং, অন্তত 'আরো একটি ইচ্ছা' প'ড়ে মনে হয়, বুদ্ধদেব বসুও তাঁর কবিতায় প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত।

তথাচ, পূর্ণেন্দুবিকাশের দশমাত্রা ছন্দের ব্যবহার ঈর্ষণীয়; এবং 'সে যেন জালের মাছি, কাতরায়: আসবো, বেরিয়ে আমি আসবো,' ('অনৈয়ায়িক'), কিংবা '—নির্বেদ আয়ু উপড়িয়ে ফেল তাকে। দূষিত দাঁতের মতো।' ('একটি

ইচ্ছা')—এ-সব কবিতায় কথ্যরীতির বিশিষ্ট ব্যবহার তিনি করেছেন। বিশেষত, 'কয়েকটি মুহূর্তে'র চারটি কবিতার মধ্যে একটি :

'পৌর সমিতির ডোম ফেলে যায় মরা সাপটাকে,
কয়েকটা কাক জুটে সেইখানে চালায় দরবার,
হঠাৎ শকুন এলে তাড়াবেই, তারি শলা আঁটে,
নিস্তেল কুপির মতো নিবে আসে শীতের দুপুর।'

সুন্দর। 'অন্তর্গতি'র কবির দেখবার চোখ আছে, অন্তর্লীন হ'য়েও তিনি আশে-পাশের ভূগোল ইতিহাস থেকে রস সংগ্রহ করতে পারেন, এবং সবচেয়ে বড়ো কথা, পড়বার পর মনে তাঁর কবিতার একটা রেশ থেকে যায়। এই অনুরণনের ক্ষমতা সমসাময়িক বাংলা কবিতায় আপাতত দুর্লভ বলা চলে।

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

স্থিতি

মণিভূষণ ভট্টাচার্য

প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখে তুলসীতলায়
সমর্পিত সন্ধ্যার প্রণামে,
রোমাঞ্চিত অন্ধকার নক্ষত্রের প্রথম চুম্বনে॥

সুপেয় শহরে নয়, প্রাগুক্ত গ্রামের ভালোবাসা;
ঘরে-ফেরা পাখিদের কলকণ্ঠ নীড়ে
তন্দ্রালীন শিশির-পিপাসা॥

ধ্রুবকের অন্ধকার সারাৎসার তারার আলোয়
রহস্যের কালো নদী আঁকে,
রাত্রির গহন থেকে আরো-দূর তিমির গহনে
চেতনার শুকতারা থাকে॥

তুমি থাকো তারই আশে-পাশে,
সন্তাপে, সুখে ও প্রেমে শোণিতের নীল সর্বনাশে॥

তিনটি ট্রিওলেট

সলিলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

এক

তোমার দু-চোখে রাত্রি যে নিলো বাসা—
উদ্ধত মূঢ় সূর্যের পরাজয় !
অন্ধকারের অতল তরল ভাষা—
দু-চোখে তোমার রাত্রির ভালোবাসা।
বুক দুরুদুরু, থরোথরো কাঁপি ভয়ে—
তবু জাগে প্রাণে সর্বনাশের আশা।
তোমার দু-চোখে রাত্রি নিয়েছে বাসা—
উদ্ধত মূঢ় সূর্যের পরাজয়।

দুই

এখানে-ওখানে যেখানেই যাও—
সে আছে তোমার সঙ্গে-সঙ্গে।
এলোমেলো হাওয়া, কম্পিত ঝাউ,
ঝাউয়ের কান্না, যেখানেই যাও।
শুনবে শোণিতে প্রতি তরঙ্গে
তার কথা, সুর।···হও না উধাও ;
কী ক'রে এড়াবে, যেখানেই যাও—
সে আছে, থাকবে, সঙ্গে-সঙ্গে।

তিন

তুমি যখন কাঁদো আমার ভালো লাগে।
তাকিয়ে দেখি, দু-চোখ ভ'রে নিটোল মুক্তোফল !

দুঃখে শোকে রাগে কিংবা অনুরাগে
যখন তুমি কাঁদো আমার ভালো লাগে।
মনে করো মেঘলা বেলা বৃষ্টিতে বিহ্বল
তখন যদি ঝিকমিকিয়ে সূর্য জাগে—
তেমনি তোমার কান্না আমার ভালো লাগে—
তাকিয়ে দেখি, কাজল-চোখে টলোটলো নিটোল মুক্তোফল॥

রতিবিলাস

সুভাষকুমার মিত্র

মিথুন-লগ্ন হ'তে রতিবিলাপের আর কত দেরি,
হে সুন্দরী।
দিনরাত তোমাকে ঘিরে
রৌদ্রছায়ার লুকোচুরি খেলা।
আকাশের দূতী দেহনদীর দু-তীরে তার স্বর্ণ ছড়ায়।

বিস্মৃতি হ'তে স্মরণে তুমি কতবার
আমার অনুভূতিগুলিকে কুড়িয়ে নিয়ে
মালা গাঁথো, পরো, আর ফেলে দাও।

প্রেম প্রকৃতি শিল্প

রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী

হঠাৎ উঠলো জ্ব'লে ঝুমকো-জবায় সেই আলো
বিদেশের; যেতে-যেতে মনে হ'লো তার
গণিকা, হুইস্কি, তবলা, চতুর ইয়ার
কিছু নয়: তার চেয়ে প্রার্থনীয়
সংসারের পেয়ালায় শান্ত সুখদুঃখের অমিয়,
একটি নির্মল স্বচ্ছ শুভ্র সুর; অথচ সেদিন
সিঁদুর ঘোমটা শাঁখা, বুকের সহজ উৎসারণ
শীতল লাগলো তার, নিজের বৌয়ের কাছে বেশ্যার রঙিন
কামকলা চায় যারা—সে-ও ছিলো তাদেরি একজন।

হৃদয়ের উপস্থিতি অনুভব করেনি কখনো
জঘনের অন্ধকারে। ময়দার ডেলার মতো নিতম্বমন্থনে
ছিলো তার একমাত্র সুখ। হেসেই উড়িয়ে দিতো অন্য কোনো
সুগভীর অভিপ্রায় শারীরিক রাত্রির বয়নে
কত সুন্দরীর চুলে খুঁজে-খুঁজে ঝর্নার জল
পেয়েছে যে এই অনুশীলিত শরীর;
সুগন্ধি রুমাল, ধূপ, মন্ত্রপূত ফুল কিংবা ফল
কিছুই লাগে না তার (ভেবেছিলো) যার হাতে আগুনের তীর।

কতদিন মদ গিলে ডুবে যেতো অতল গহ্বরে,
পরাভূত অধীশ্বর, শয়তান বাস করে যেখানে ভৌতিক
নরকের ঝিলিমিলি রঙে। হয়তো বা অলৌকিক
তখনো জেলেছে দীপ হলিহক অথবা টগরে।

বিস্মিত চোখের সামনে খুলে গেলো অন্য এক-লোক
যেখানে পার্থিব মুখ সবুজ সৌরভে অনশ্বর ;
গাছ পাখি কুঁজো লোক সব-কিছু অম্লান সুন্দর,
বিশুদ্ধ আনন্দ এক : যেন কোনো মৃত কোঁচবক
সে-আশ্চর্য গানে উড়ে গেলো—হলদে পঞ্জিকার
যৌন উপাখ্যানে কোনো চিহ্ন নেই যার।

কবর-খোঁড়ার গান

শামসুর রাহমান

মদের নেশা খাঁটি সারা জাহানে,
বাকি যা থাকে তার বেবাক ঝুট।
বাঘিনী যেন সেই মেয়েমানুষ,
যার আঁধারে কাল কেটেছে রাত।

যার আঁধারে কাল কেটেছে রাত
নেশার মতো তার স্মৃতির জ্বালা।
আলিঙ্গনে তার দুনিয়াদারি
নিমেষে ভুলে যাই অতল মোহে।

নিমেষে ভুলি সাধ অতল মোহে।
মোহিনী ও-মুখের মিথ্যা বুলি
সত্যসার ভাবি, এবং আমি
ধারি না ধার কোনো মহোদয়ের।

ধারি না ধার কোনো মহোদয়ের,
আমরা তিনজন খুঁড়ছি গোর।
নিপুণ বিদ্রূপে অন্তহীন
দূরের আসমানে জ্বলে দিনার।

দূরের আসমানে জ্বলে দিনার।
কোদালে অবহেলে উপড়ে আনি
মাটির ঢেলা আর মড়ার খুলি।
শরিফ কেউকেটা কী ক'রে চিনি ?

শরিফ কেউকেটা কী ক'রে চিনি ?
মাটির নিচে পচে অন্ধ গোরে
হয়তো সুন্দরী, কুরূপী কেউ।
কোরো না বেয়াদবি বান্দা তুমি !

কোরো না বেয়াদবি বান্দা তুমি !
বাদশা নেই কেউ, গোলাম সব,
বেগম চায় পেতে বাঁদির সুখ :
আউড়ে গেছে কতো সত্যপীর।

আউড়ে গেছে কতো সত্যপীর :
সমরকন্দ্ আর বোখারা তার
রূপসী মাশুকের যোগ্য নয়।
সে-সব ছেঁদো কথা, মস্ত ফাঁকি।

সে-সব ছেঁদো কথা, মস্ত ফাঁকি।
বিবেক বিলকুল লক্ষ্মীছাড়া,
মনের পশুটাও চশমখোর।
আমরা তিনজন খুঁড়ছি গোর।

আমরা তিনজন খুঁড়ছি গোর।
হয়তো রুটি আর গোলাপ-কুঁড়ি
যুগ্মতায় জলে চাওয়া-পাওয়ায়,
নেশার মতো খাঁটি নেই কিছুই।

নেশার মতো খাঁটি নেই কিছুই,
সাচ্চা শুধু এই দেহের দাবি।
মানতে নয় রাজি বেয়াড়া মন
দীন্ ও দুনিয়ার ধাপ্পাবাজি ॥

'ল্য ফ্লর দ্যু মাল' থেকে

শার্ল বোদলেয়ার

তার চুল

কুন্তলরাশি, গ্রীবায় স্খলিত কোঁকড়া ফেনায়,
হে অলকদাম, আলস্যময় ঘ্রাণে মাতাল !
কী পুলক ! যবে সান্ধ্য কোঠাতে আঁধার ঘনায়
কেশরগুচ্ছে ঘুমোনো স্মৃতিরা আসর জমায়,
তুলে নিয়ে নাড়ি হাওয়ায় তাদের, যেন রুমাল।

এশিয়ার শ্লথবিলাস, দীপ্তি আফ্রিকার,
সুদূর জগৎ, অনুপস্থিত, লুপ্তপ্রায় !
গন্ধগহন সেই অরণ্যে প্রাণ আমার—
অন্যেরে যথা ঠেলে নিয়ে চলে সুরবাহার—
তেমনি তোমার সুবাসে, প্রেয়সী, ভেসে বেড়ায়।

যাবো আমি, যেথা মানব এবং তরুলতাও
আপন রসে ও রৌদ্রে বিবশ দীর্ঘ দিন,
প্রবল অলক, হও ঢেউ, যাতে আমিও উধাও !
হে আবলুশের সাগর, স্বপ্নে চোখ ধাঁধাও !
মাস্তুল, পাল, মাল্লা, আগুন যাতে বিলীন :

প্রতিধ্বনিত বন্দর, যেথা আমার প্রাণ
বর্ণ, গন্ধ, শব্দের ঘন ঝাপটে মাতে ;
জলীয় কনকে ভঙ্গিমগতি সাগরযান
বিশাল বাহুর বিস্তারে এক বেপথুমান
শাশ্বত-তাপ-বিদ্ধ আকাশে চায় জড়াতে।

অন্যটি যাতে বন্দী, সে-কালো সাগরজলে
ডুবে যাক মাথা, নেশার লালস যাকে মাতায় :
আমার সূক্ষ্ম সত্তা, ঢেউয়ের আদরে গ'লে
অনন্ত অবসরের স্নিগ্ধ দোলায় দুলে
ফের খুঁজে পাক অন্তঃসত্ত্বা অলসতায়।

নীল চুল, যেন আঁধারের বিস্তীর্ণ চাতাল,
গগনগোলকে ক'রে দাও তুমি আরো গভীর ;
ছুঁয়ে-ছুঁয়ে ঐ কোঁকড়া কোমল পক্ষ্মজাল
আমি, অস্থির, মিশ্র সুবাসে হই মাতাল
নারিকেল-তেল, আলকাৎরা ও কস্তুরীর।

দীর্ঘপ্রহর! চিরকাল! ঐ কেশে আমার
অঞ্জলি দেবে ছড়িয়ে মুক্তা, পান্না, হীরা—
আমার রতির মন্ত্রে বধির র'বে না আর,
স্বপ্নমুখর হে মরুকানন, হে ভৃঙ্গার,
মহাগণ্ডূষে পান করি যাতে স্মৃতির সুরা!

তবু অতৃপ্তা

শ্যামাঙ্গী, নিশার মতো, ওগো দেবী অদ্ভুতের দূতী,
ডাকিনী, আবলুশগাত্রী, তুমি মধ্যরাত্রি সন্তান,
অঙ্গে মেশে মৃগনাভি আর দূর হাভানার ঘ্রাণ—
আফ্রিকার কোন ওবি, সাভানার ফস্টাসের কৃতি!

আফিম, মদের নেশা ফেলে দিয়ে—আমার আকৃতি
মানে তোর কামলিপ্ত ওষ্ঠাধরে অমৃতসমান ;
নয়নের কূপে তোর নির্বেদের তৃষ্ণা অবসান,
ধায় যবে তোর দিকে কারাভাঁয় সারিবদ্ধ রতি।

আত্মার চুল্লির মতো, ঐ লোল, কালো চক্ষু থেকে
অগ্নি হেনে, রে পিশাচী, কত আর পোড়াবি আমাকে!
আমি সেই স্টিক্স নই, যা তোকে জড়াবে নয় বার,

আর, হায়, মেগীরা-লম্পট আমি, কিছুতে পারি না
দর্প তোর চূর্ণ ক'রে, ফিরে পেতে নিজ অধিকার,
যেহেতু নরক তোর শয্যা, আর আমি প্রসার্পিনা।

আত্ম-প্রতিহিংসা

মারবো আমি তোকে, যেন কশাই,
ঘৃণার লেশ নেই, শূন্য মন,
কিংবা শিলাতটে মুসা যেমন!
তাহ'লে আঁখি তোর যদি খসায়

আমার সাহারার সান্ত্বনাতে
দুঃখধারা এক উচ্ছ্বসিত ;—
আমার অভিলাষ, আশায় স্ফীত
সে-লোনা জলে পারে ভাসতে যাতে

নোঙর-তুলে-নেয়া তরী যেমন।
মাতাল এ-হৃদয়ে কান্না তোর
শব্দ তুলে ক'রে দিক বিভোর,
ঢাকের নাদে যেন আক্রমণ!

নই কি আমি এই দিব্য গানে
স্বরের অন্বয়ে এক বেসুর,
যেহেতু ব্যঙ্গের মুঠি চতুর
আমার সত্তারে নিত্য হানে?

আমারই কণ্ঠ সে—কী জঞ্জাল!
আমারই কালো বিষ রক্তে মাতে!
আমি সে-উৎকট মুকুর, যাতে
আপন মুখ দ্যাখে সে-দজ্জাল!

আমিই চাকা, দেহ আমারই দলি!
আঘাত আমি, আর ছুরিকা লাল!
চপেটাঘাত, আর খিন্ন গাল!
আমিই জল্লাদ, আমিই বলি।

ছন্নছাড়া আমি শূন্যবাসী
আপন হৃদয়ের রক্ত গিলে,
কখনো প্রীত হ'তে শিখিনি ব'লে
আমার আছে শুধু অট্টহাসি।

এখনো ভুলিনি তাকে

এখনো ভুলিনি তাকে—নগরের পা ঘেঁষে, নির্জন,
আমাদের শাদা বাড়ি, ছোটো, কিন্তু শান্ত সারাক্ষণ।
পমোনা, পাথরে গড়া, আর এক স্থবির ভেনাস
বিরল ঝোপের পিছে ঢাকে নগ্ন অঙ্গের আভাস।
আর সূর্য, সন্ধ্যাবেলা, প্রপাতের মতো বাতায়নে
অবিরল চূর্ণ হ'য়ে প্রজ্বলিত রশ্মির বর্ষণে,
অদ্ভুত আকাশ থেকে, স্ফারনেত্রে, চেয়ে দ্যাখে যেন
আমাদের সান্ধ্যভোজ, দীর্ঘায়িত, শব্দ নেই কোনো।
সেই দীপ্তি, মোমের আলোয় মিশে করেছ উজ্জ্বল
বনাতের ছেঁড়া পর্দা, আমাদের স্বল্প অন্নজল।

মহাপ্রাণ সেই দাসী

মহাপ্রাণ সেই দাসী, তুমি যাকে ঈর্ষা করেছিলে,
মগ্ন হ'লো ঘুমে আজ তুচ্ছ তৃণপল্লবের তলে।
তবু চলো, কিছু ফুল দিয়ে আসি তাকে একদিন,
আহা, মৃত, মৃত ওরা, কী বিরাট সন্তাপে বিলীন!
যবে রিক্ত তরুদল নিশ্বসিত ম্লান অক্টোবরে,
মর্মরফলক ঘিরে খেদময় বায়ু ঘুরে মরে,
তখন ঘুমোই যারা বেঁচে থেকে, উষ্ণতায় লীন,
কী কঠিন ভাবে ওরা আমাদের, কী হৃদয়হীন!
এদিকে বিকট কালো স্বপ্নেরা ওদের ছিঁড়ে খায়,
সদালাপ, শয্যাসঙ্গী, কিছু নেই; হিমেল হাওয়ায়
জ'মে-যাওয়া বুড়ো হাড়, পরিশ্রমী কৃমির সম্ভার,
টের পায় শীতের তুষার গ'লে ঝ'রে পড়ে, আর
খ'সে পড়ে শতাব্দী, তবুও কোনো বন্ধু বা স্বজন
ছেঁড়া ফুল ফেলে দিয়ে সে-মণ্ডপে রাখে না নূতন।

ধরো, কোনো সন্ধ্যায় যখন কাঠ অগ্নিকুণ্ডে ফোঁশে,
যদি তাকে দেখি, শান্ত, অস্পষ্ট চেয়ারে আছে ব'সে;
যদি ডিসেম্বরে, কোনো হিমস্রব নীল যামিনীতে
দেখি, সে কুঁকড়ে আছে এক কোণে, ঘরের নিভৃতে;
যদি উঠে আসে, মৌন, চিরন্তন শয্যাতল ফেলে,
তার বুড়ো ছেলেকে আশ্রয় দিতে মাতৃচক্ষু মেলে—
তাহ'লে, স্খলিত অশ্রু দেখে তার পল্লবের তলে,
সেই পুণ্য আত্মাকে উত্তর দেবো কোন কথা ব'লে?

ডুয়েল

ছুটে এলো যুগপৎ দুই যোদ্ধা ; অস্ত্রের সংঘাত
দ্যুতি আর শোণিত ছিটিয়ে দেয় আহত বাতাসে।
এই খেলা, লৌহনাদ যৌবনের—যখন হঠাৎ
উচ্চতানে ধরা পড়ে প্রণয়ের চীৎকৃত উল্লাসে।

গেছে ভেঙে তলোয়ার !—আমাদেরই যৌবনের মতো,
প্রিয়তমা ! কিন্তু আজ দাঁত আর নখের উৎসাহ
কৃপাণের বঞ্চনার প্রতিশোধে সবেগে উদ্যত।
—হা রে বৃদ্ধ হৃদয়ের ব্রণদুষ্ট প্রণয়ের দাহ !

দ্যাখো বীরদ্বয়ে, তারা বদ্ধ হ'য়ে ক্রূর আলিঙ্গনে
গড়ায় গহ্বরে, যেথা চিতা আর নেকড়ে দেয় হানা,
তাদের বিদীর্ণ ত্বক ফুল ফোটে শুকনো কাঁটাবনে।

—এই তো নরক, বহু বন্ধুদের নির্দিষ্ট ঠিকানা !
আয় রে অমানুষিক আমাজনী, গড়াই দু-জনে
মনস্তাপ ছুঁড়ে ফেলে, জ্বালাময় ঘৃণার বন্ধনে !

শত্রু

আমার যৌবন ছিলো শুধু এক আঁধার তুফান,
তির্যক সূর্যেরা যাকে কদাচিৎ করেছে উজ্জ্বল ;
বজ্র আর বৃষ্টিতে বিধ্বস্ত হ'য়ে, আমার বাগান
ফলিয়েছে কেবল একটি-দুটি রক্তরাঙা ফল।

এদিকে, মনের প্রান্তে, হেমন্ত যে আগত এখনই,
শাবল, কোদাল নিয়ে ব্যস্ত হ'তে হবে এইবার—

তবে যদি রক্ষা পায় ধারাজলে ভেসে-যাওয়া জমি,
ফাটা কবরের মতো খানাখন্দ খুলে আছে যার।

যে-নূতন ফুলদলে স্বপ্নে আমি নিরন্তর দেখি,
তারা, এই প্লাবিত তটের মতো ভূমিতলে, কখনো পাবে কি
অলৌকিক সেই পথ্য, যা তাদের শক্তির সঞ্চয় ?

—আক্ষেপ, আক্ষেপ শুধু ! সময়ের খাদ্য এ-জীবন,
যে-গুপ্ত শত্রুর দাঁতে আমাদের জীবনের ক্ষয়
বাড়ায় বিক্রম তার আমাদেরই রক্তের তর্পণ।

আবেশ

তোর কাছে ভীত আমি, মহাবন, যেন ক্যাথিড্রাল ;
অর্গ্যানগর্জন তোর ; আমাদের শাপাক্ত হৃদয়—
শোকের প্রকোষ্ঠ ; সেথা নাভিশ্বাস নিত্য দেয় তাল—
তোর 'অন্ধকার থেকে' স্বননের প্রতিধ্বনিময়।

তোকে ঘৃণা করি, সিন্ধু ! যত তোর লম্ফ, চ্যাঁচামেচি,
খুঁজে পাই আমার আত্মার তলে। যে-তিক্ত উল্লাস
অপমানে ক্রন্দনে নিবিড় হ'য়ে বলে, 'হেরে গেছি'—
সে-বিরাট অট্টহাসি ফিরে দেয় তোর জলোচ্ছ্বাস।

কত সুখী হবো আমি, যদি চেনা ভাষায় প্রকট
নক্ষত্রকিরণে, রাত্রি, লুপ্ত ক'রে দিস একেবারে !
কেননা আমি যে খুঁজি কালো আর নগ্ন শূন্যতারে !

কিন্তু ঘোর অন্ধকার—সে নিজেই হ'য়ে ওঠে পট
যেখানে আমার চক্ষু জন্ম দেয় বিপুল সংখ্যায়
সে-সব অতীতে, যারা চেনা চোখে এখনো তাকায়।

অন্ধেরা

ভেবে ছাখো, হৃদয়, নিশার স্বপ্ন যাদের চালক !
অনন্ত, অস্পষ্ট ওরা, হাস্যকর, আতঙ্কে অতুল ;
কিংবা যেন দোকানের জানালায় সাজানো পুতুল ;
কে জানে কোথায় হানে নিরালোক চক্ষুর গোলক।

ঐ সব চোখ, আর ঐশ্বরিক ফুলকি নেই যাতে,
তবু করে, আকাশে উত্থিত হ'য়ে, দূরের সাধনা,
একলক্ষ্য, অর্থহীন ; গুরুভার মাথার ভাবনা
কখনো, স্বপ্নের তলে ডুবে গিয়ে, নামে না ফুটপাতে।

চিরন্তন স্তব্ধতার সহোদর, অনন্ত শর্বরী
পার হ'য়ে ধীরে-ধীরে চলে তারা। হে মহানগরী !
তুমি যবে নেচে, কুদে, চারদিকে তুলে উচ্চতান

হ'য়ে ওঠো প্রমোদের যন্ত্রণার প্রেমিক প্রহরী—
আমিও প্রগাঢ়তর মূঢ়তায় পথে-পথে ঘুরি,
আর ভাবি : আমরা অন্ধেরা ঐ নভতলে কী করি সন্ধান ?

যাত্রী বেদেরা

কাঁধে সন্ততি, দৃষ্টিতে দুর্মদ,
দল বেঁধে কাল বেরিয়েছে দৈবজ্ঞ,
ঝুলিয়ে, শিশুর হিংস্র ক্ষুধার ভোগ্য
স্তনবিস্ফারে অফুরান সম্পদ।

যানে পরিজন গচ্ছিত ; পুরুষেরা
হাঁটে পাশে-পাশে, অস্ত্রঝলকে দীপ্ত,

আর্ত নয়নে খোঁজে নভতলে লিপ্ত
অনুপস্থিত অলৌকিকের ডেরা।

পতঙ্গ, তার রুক্ষ বিবর থেকে,
চৌদুনে তান লাগায় ওদের দেখে ;
এবং সিবেলী যেহেতু প্রণয়াসক্ত,

ঘাস হয় আরো সবুজ, ফুলে ও স্রোতে
ফোটে মরু, শিলা ; আঁধার ভবিষ্যতে
পথিকের চেনা মহাদেশ উন্মুক্ত।

এক পথচারিণীকে

গর্জনে বধির ক'রে রাজপথে বেগ ওঠে দুলে।
কৃশতনু, দীর্ঘকায়, ঘন কালো বসনে সংবৃত,
চলে নারী, শোকের সম্পদে এক সম্রাজ্ঞীর মতো,
মহিমামন্থর হাতে ঘাঘরার প্রান্তটুকু তুলে—

সাবলীল, শোভমান, ভাস্করিত কপোল, চিবুক।
আর আমি—আমি তার চক্ষু থেকে, যেখানে পিঙ্গল
আকাশে ঝড়ের বীজ বেড়ে ওঠে, পান করি, কম্পিতবিহ্বল
মোহময় কোমলতা, আর এক মর্মঘাতী সুখ।

রশ্মি জ্বলে…রাত্রি ফের !—মায়াবিনী, কোথায় লুকোলে ?
আমাকে নতুন জন্ম দিলো যার দৃষ্টির প্রতিভা—
আর কি হবে না দেখা ত্রিকালের সমাপ্তি না-হ'লে ?

অন্য কোথা, বহু দূরে ! অসম্ভব ! নেই আর সময় বুঝি বা !
পরস্পর-অজ্ঞতায় স'রে যাই—আমারই যদিও
কথা ছিলো তোমাকে ভালোবাসার, জানো না তুমিও !

অন্ধেরা

ভেবে ছাখো, হৃদয়, নিশার স্বপ্ন যাদের চালক !
অনন্ত, অস্পষ্ট ওরা, হাস্যকর, আতঙ্কে অতুল ;
কিংবা যেন দোকানের জানালায় সাজানো পুতুল ;
কে জানে কোথায় হানে নিরালোক চক্ষুর গোলক।

ঐ সব চোখ, আর ঐশ্বরিক ফুলকি নেই যাতে,
তবু করে, আকাশে উত্থিত হ'য়ে, দূরের সাধনা,
একলক্ষ্য, অর্থহীন ; গুরুভার মাথার ভাবনা
কখনো, স্বপ্নের তলে ডুবে গিয়ে, নামে না ফুটপাতে।

চিরন্তন স্তব্ধতার সহোদর, অনন্ত শর্বরী
পার হ'য়ে ধীরে-ধীরে চলে তারা। হে মহানগরী !
তুমি যবে নেচে, কুদে, চারদিকে তুলে উচ্চতান

হ'য়ে ওঠো প্রমোদের যন্ত্রণার প্রেমিক প্রহরী—
আমিও প্রগাঢ়তর মূঢ়তায় পথে-পথে ঘুরি,
আর ভাবি : আমরা অন্ধেরা ঐ নভতলে কী করি সন্ধান ?

যাত্রী বেদেরা

কাঁধে সন্ততি, দৃষ্টিতে দুর্মদ,
দল বেঁধে কাল বেরিয়েছে দৈবজ্ঞ,
ঝুলিয়ে, শিশুর হিংস্র ক্ষুধার ভোগ্য
স্তনবিস্ফারে অফুরান সম্পদ।

যানে পরিজন গচ্ছিত ; পুরুষেরা
হাঁটে পাশে-পাশে, অস্ত্রঝলকে দীপ্ত,

আর্ত নয়নে খোঁজে নভতলে লিপ্ত
অনুপস্থিত অলৌকিকের ডেরা।

পতঙ্গ, তার রুক্ষ বিবর থেকে,
চৌদুনে তান লাগায় ওদের দেখে ;
এবং সিবেলী যেহেতু প্রণয়াসক্ত,

ঘাস হয় আরো সবুজ, ফুলে ও স্রোতে
ফোটে মরু, শিলা ; আঁধার ভবিষ্যতে
পথিকের চেনা মহাদেশ উন্মুক্ত।

এক পথচারিণীকে

গর্জনে বধির ক'রে রাজপথে বেগ ওঠে ছলে।
কৃশতনু, দীর্ঘকায়, ঘন কালো বসনে সংবৃত,
চলে নারী, শোকের সম্পদে এক সম্রাজ্ঞীর মতো,
মহিমামন্থর হাতে ঘাঘরার প্রান্তটুকু তুলে—

সাবলীল, শোভমান, ভাস্করিত কপোল, চিবুক।
আর আমি—আমি তার চক্ষু থেকে, যেখানে পিঙ্গল
আকাশে ঝড়ের বীজ বেড়ে ওঠে, পান করি, কম্পিতবিহ্বল
মোহময় কোমলতা, আর এক মর্মঘাতী সুখ।

রশ্মি জ্বলে···রাত্রি ফের !—মায়াবিনী, কোথায় লুকোলে ?
আমাকে নতুন জন্ম দিলো যার দৃষ্টির প্রতিভা—
আর কি হবে না দেখা ত্রিকালের সমাপ্তি না-হ'লে ?

অন্য কোথা, বহু দূরে ! অসম্ভব ! নেই আর সময় বুঝি বা !
পরস্পর-অজ্ঞতায় স'রে যাই—আমারই যদিও
কথা ছিলো তোমাকে ভালোবাসার, জানো না তুমিও !

নরকে ডন জুয়ান

যেদিন ডন জুয়ান, শারনেরে কড়ি গুনে দিতে
নেমে এলো পাতালসলিলে, এক গম্ভীর ভিক্ষুক
আন্তিস্থিনীসের মতো দৃপ্ত চোখে, বলিষ্ঠ বাহুতে
দাঁড়ের কর্তৃত্ব নিয়ে হ'লো প্রতিহিংসায় উৎসুক।

ঘোর কালো আকাশে কাৎরে ওঠে মেয়েরা উত্তাল,
ছিন্নভিন্ন গাত্রবাস, উন্মোচিত স্তনগুলি ঝোলা;
বিরাট মিছিলে চলে যূপকাষ্ঠে বধ্য পশুপাল,
দীর্ঘায়িত ক্রন্দন পশ্চাতে টানে, ফুরোয় না পালা।

সিনারেল্লে, দেঁতো হেসে, খেসারৎ চায় ফিরে পেতে;
এদিকে ডন লুইস—মৃত যারা ঘোরে এলোমেলো,
তাদের দেখিয়ে দেন, অঙ্গুলির কম্পিত সংকেতে,
যে-পাপিষ্ঠ পুত্র তাঁর শুভ্র কেশে ব্যঙ্গ করেছিলো।

একদা প্রেমিক, আর তার পরে প্রতারক পতি
যে ছিলো, গা ঘেঁষে তার সাধ্বী, রোগা এলভিরা ঘনায়,
যেন ফের দাবি করে, যে-পরম হাসির আরতি
মন্ত্রঃপূত প্রভাতেরে মেখেছিলো কোমল সোনায়।

বর্মধারী, ঋজু এক শিলাময় বিরাট পুরুষ
হাল চেপে ধ'রে চলে কালো জল দুই দিকে চিরে;
কিন্তু বীর, অসিতে হেলান দিয়ে, নিস্তব্ধ, বেহুঁশ,
বিদীর্ণ জলের রেখা ছাখে শুধু, তাকায় না ফিরে।

আত্মস্থতা

হে আমার দুঃখ, তুমি প্রাজ্ঞ হও, স্থৈর্য নাও শিখে।
চেয়েছিলে সন্ধ্যারে; আসন্ন সে যে, এই তো আগত:
ধূমল মণ্ডল এক নগরীকে ক্রমে দেয় ঢেকে,
শান্ত কারো মন, আর অন্য কেউ দুশ্চিন্তায় নত।

এখনই ছুটুক ওরা—ক্ষমাহীন জল্লাদ, প্রমোদ,
চালায়, চাবুক মেরে, যে-কুৎসিত, ক্লিন্ন জনগণে,
ফুর্তির গোলামি ক'রে অনুতাপে তার পরিশোধ
দিক তারা;—দুঃখ, এসো, হাত রাখো হাতে। চলো দুইজনে

যাই বহুদূরে। চেয়ে ছাখো, আকাশের বারান্দায়
নিঃশেষ বৎসর সব ঝুঁকে আছে প্রাচীন সজ্জায়;
দম্ভময় মনস্তাপ জল থেকে ধীরে তোলে মাথা;

এদিকে মুমূর্ষু সূর্য শয্যা নেয় মেঘের তোরণে;
আর, যেন পূর্বাকাশে দীর্ঘায়িত শববস্ত্র পাতা,
সেইমতো, শোনো প্রিয়, রাত্রি নামে মধুর চরণে।

মধ্যরাত্রির পরীক্ষা

মধ্যরাত্রি প্রতিধ্বনিতে লীন:—
ঘড়ির ঘণ্টা, কুটিল ব্যঙ্গভরে
শুধায়, বলো তো, কাটালে কেমন ক'রে
এ-ক্ষণে হ'লো নিঃশেষ যেই দিন?
—আজ, হায় আজ, নিয়তিবিধুর তিথি,
ত্রয়োদশ দিন, অশুভ শুক্রবার,
নিষ্ফল ক'রে সর্বজ্ঞানের ভার
জাগ্রত শুধু পাপাচরণের স্মৃতি।

যীশু, ভগবান, সব সংশয়াতীত,
তাঁর বিরুদ্ধে রটিয়েছি বিদ্রোহ !
ভোজনশালায় হয়েছি গলগ্রহ
বিকট ধনীর প্রাচুর্যে পরিবৃত।
আমরা, যোগ্য অসুরসেবকগোষ্ঠী—
যাকে ভালোবাসি তাকেই অসম্মান,
যা-কিছু ঘৃণ্য তাকেই অর্ঘ্যদান
করেছি, জাগাতে জন্তুর সন্তুষ্টি ;

ঘাতকের মতো—কাপুরুষ, চাটুকার—
দুঃখী দীনের হয়েছি অত্যাচারী ;
বিরাট, কঠিন, ষণ্ডমুণ্ডধারী
নির্বুদ্ধিরে করেছি নমস্কার ;
জড়পদার্থে চুম্বন ক'রে ধন্য
মহানিষ্ঠায় আমরা নির্বিকার
পচা, গলা, পুঞ্জিত জঘন্যতার
পাংশুল বিকিরণেই মেনেছি পুণ্য।

অবশেষে, যাতে প্রলাপে আত্মহারা,
ডুবে যায় এই ঘৃণিত সংবিৎ,
আমরা, বীণার গরীয়ান পুরোহিত,
মাতাল মরণে রত্নে সাজায় যারা—
ক্ষুৎপিপাসার উৎসাহ ব্যতিরেকে
আমরা করেছি উৎকট পানাহার !…
—নিবে যাক বাতি, অতল অন্ধকার
আমাদের সব লজ্জাকে দিক ঢেকে !

অনুবাদ : বুদ্ধদেব বসু

গট্‌ফ্রীড বেন্‌-এর কবিতা

আলাস্কা

শস্যপ্রান্তরের উপান্তে দাঁড়িয়ে সে বলেছিলো :
ঘাসফুলের আনুগত্য আর বায়বীয়তা
রঙিন মহিলাদের কাছে চমৎকার এক নকশার মতো।
আমি কিন্তু বেছে নেবো আফিমফুলের গভীর গানের গলা,
তা জ'মে-যাওয়া রক্ত আর রজঃস্রাবের কথা মনে পড়িয়ে দেয়,
মনে পড়ায় চাপ, শ্বাসকষ্ট, ক্ষুধা আর পটল তোলার কথা—
অর্থাৎ, পুরুষের ধূমল পথটাকে।

বৃত্ত

একটি গণিকা তার অনন্য দাঁত
—সে মারা গিয়েছিলো আত্মপরিচয় গোপন রেখে—
বাঁধিয়েছিলো সোনা দিয়ে।
(অন্যগুলি আচমকা পালিয়েছিলো
যেন এক নিঃশব্দ চুক্তি ক'রে।)
সেই দাঁতের সোনা ছিনিয়ে নিলে শবমণ্ডকের স্যাঙাৎ,
আর বন্ধক রেখে নাচঘরে গেলো ফুর্তি করতে,
কারণ, তার মত অনুযায়ী :
'শুধু মাটিরই ফিরে যাওয়া উচিত মাটিতে।'

উত্তরসাগরের তীরে

আত্মার বিষাদ—,
একটি গৃহ, একটি কণ্ঠের গান,
একটি গৃহ, নিষ্কলঙ্ক,
যেখানে ইংরেজি মুদ্রার ঝনৎকার,
ভাগ্যবানদের একটি গৃহ,
সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যে উজ্জ্বল,
রুপোলি আর গোলাপি চারটি দেয়াল
উত্তরসাগরের তীরে।

সে-মেয়ে গাইছে গান :—আর উচ্চবর্ণের লোকেরা —
ভাইকিং আর ইংরেজ পুরুষ,
লোভী শ্বেতজাতির বংশধর—
রুদ্ধশ্বাস হ'য়ে শোনে।
ঠিক তেমনি উৎকর্ণ তাদের সপ্রতিভ নারীগণ
পশুচর্মে আর জড়োয়া গয়নায় যারা আবৃত,
আর সারি-সারি মুক্তোয়
যা ডুবুরিরা বাহ্‌রীন দ্বীপপুঞ্জের চারপাশ থেকে তুলেছে।

বাজে কণ্ঠ—নিষ্কলঙ্ক,
বিদেশী শব্দ ভ'রে তোলে ঘর
'শান্তিতে বিশ্রাম করে, আত্মা,
'অবশেষে এলো তোমার শান্তি'—
এলো! আর সকলে উৎকর্ণ হ'য়ে পান করে
শুবার্টের স্তোত্র
আর কেপটাউন থেকে সাংহাই পর্যন্ত
হাঙর-পৃথিবী ডুবে যায় দৃষ্টি থেকে।

চোরাই, পোড়া, ছাল-ছাড়ানো,
কুঠুরিতে, বাঁশের তাঁবুতে,
আফিম, নিগ্রোদের ঘা, সেণ্ট্ আর ডলার—
এ-সবের মধ্য দিয়ে উপার্জিত চাবুক,
মহীয়ান নর্ডিক জাতি,
প্রতীচীর একশিলা
সারা ঘরে স্তব্ধ হ'য়ে গেলো :
লুপ্ত হ'লো শক্তির পুরাণ।

দূরে, রুপো আর গোলাপের মধ্য থেকে,
গান গায় এই গৃহ, এই কণ্ঠ,
যে-গানের কোনো সীমান্ত নেই,
এক ভিন্ন জাতি যা ঋণ দিয়েছে,
যা শক্তিকে এক প্রবলতর প্রভাবের
বন্দী ক'রে নেয় :
মানুষ চিরন্তন, আর সে অর্চনা করছে
সুদূর দেবতাদের।

ব্রিটিশ দেয়াল, ফিনিশ দেয়াল—
বাড়িঘর—কণ্ঠ গেয়ে চলে গান—
সীমানাহীন জর্মানি
যতক্ষণ জর্মান গান প্রবহমান ;
শুধু এমনি সব ধ্বনি থেকে আসে
তার পীড়িত সন্তানদের জন্য
শ্বেত জাতির নিশ্চল নির্বেদ
আত্মার বিষাদ থেকে
নিষ্কৃতি।

একটি শব্দ, একটি বাক্যবন্ধ

একটি শব্দ, একটি বাক্যবন্ধ :—শূন্যের মধ্য থেকে উঠে আসে
অনুভূত জীবন, আকস্মিক চেতনা,
সূর্য নিশ্চল, স্তব্ধ সকল বৃত্ত,
কেবল সব-কিছু এগিয়ে আসছে একটি শব্দের কেন্দ্রে।

একটি শব্দ—আলোর এক ঝলকানি, পাখা-মেলা এক উৎক্রান্তি, এক আগুন,
আগুনের এক ঘোরানো শিখা, ছিটকে-বেরিয়ে-আসা একটি নক্ষত্র,—
এবং অন্ধকার আবার, বিশাল আর দানবিক,
পৃথিবীর আর আমার চারপাশের শূন্য প্রান্তরে।

ছাখো, নক্ষত্রবৃন্দ

ছাখো, নক্ষত্রবৃন্দ, আলোর তীক্ষ্ণ বিষাক্ত বাঁকানো
দাঁত, আর আকাশ আর সমুদ্র,
এই সব গীতময় রাখালিয়া উচ্চারণ,
ধূসর, অস্পষ্ট ; তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের সামনে,
তুমিও তেমনি, যে-তুমি আহ্বান করেছো একরাশ কণ্ঠস্বরকে,
এবং যার ভাবনাগুলি মেপে নিয়েছে তোমার বৃত্তকে,
অনুসরণ করো রাত্রির সেই ডাকহরকরাকে
নিঃশব্দ পায়ে-পায়ে।

পুরাণ, নানা কিংবদন্তী এবং শব্দসমষ্টিকে
যখন তুমি শূন্য ক'রে ফেললে,
তোমাকে যেতেই হবে তাহ'লে,
দেবতাদের অন্য কোনো সেনাবাহিনী
আর তুমি দেখতে পাবে না,

দেখতে পাবে না ইউফ্রাতিসের উপর তাদের মসনদ,
তাদের রচনাপুঞ্জ এবং দেয়ালও না—
ঢালো, মিরমিদন, ঢালো,
ঢালো অন্ধকার সুরা ভূমিতলের উপর।
হয়তো সময় আসতো, এসে হয়তো ডাক দিতে পারতো ;
জন্ম নেবার কি হ'য়ে-ওঠার যন্ত্রণা আর কান্না
সব-কিছু কুসুমিত হবে
এই রাত্রিময় সুরার প্রবহমানতায়,
দীর্ঘ দীর্ঘ কাল—হয়তো যুগ—ঝরনার মতো ব'য়ে যাবে শুষ্ক,
হয়তো কিছুই থাকবে না তীরভূমির :
সেই ডাকহরকরাকে ফিরিয়ে দাও মুকুট,
ফিরিয়ে দাও, ফিরিয়ে দাও তোমার স্বপ্ন, এবং তোমার দেবতাদের ॥

অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সংশোধন

'কবিতা'র বর্তমান সংখ্যার ১৭১ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত 'দায়' কবিতাটির নবম পংক্তির প্রকৃত পাঠ এই—

'না হ'লে, লাফানো যেত আকাশ কি পাথর জড়িয়ে'

গত পৌষ সংখ্যার ৯২ পৃষ্ঠার প্রথম পংক্তিতে 'পুণ্য ঘরে' ভ্রমক্রমে 'শূন্য ঘরে' ছাপা হয়েছে, ও দ্বাদশ পংক্তিতে 'মার্কিদেশ' শব্দটি যে আসলে 'মার্কিনদেশ' তা আশা করি পাঠকরা অনুমান করতে পেরেছিলেন।

লেখকদের বিষয়ে

* 'কবিতা'য় প্রথম প্রকাশ

জীবনানন্দ দাশ-এর একটি নূতন কাব্যগ্রন্থ 'রূপসী বাংলা' নাম দিয়ে কিছুদিন আগে প্রকাশ করেছেন সিগনেট প্রেস। **জ্যোতির্ময় দত্ত** আধুনিক কবিতা বিষয়ে একটি পুস্তক রচনার পরিকল্পনা করেছেন। **গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়** সাঁৎরাগাছিতে থাকেন, কর্ম করেন রেলওয়ে আপিশে, নানা পত্রিকায় তাঁর রচনা প্রকাশিত হ'য়ে থাকে। ***তারাপদ রায়** 'পূর্বমেঘ' পত্রিকার সম্পাদক, তাঁর আদিনিবাস পূর্ববঙ্গে, ঢাকায় বাংলা ভাষা-সংক্রান্ত আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। **দেবতোষ বসু** কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধনবিজ্ঞান অধ্যয়ন করছেন। ***নবনীতা দেব** যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্যে এম. এ. পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছেন। **পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য** বনহুগলির ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন কলেজে ইংরেজির অধ্যাপনা করেন। **বুদ্ধদেব বসু**-র নতুন কাব্যগ্রন্থ 'যে-আঁধার আলোর অধিক' এম. সি. সরকার কর্তৃক প্রকাশিত হ'লো। **মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়**-এর সম্পাদনায় বাংলা আজগবি গল্পের একটি সংকলন প্রকাশিত হচ্ছে। **শক্তি চট্টোপাধ্যায়** তাঁর প্রথম কবিতার বইয়ের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করছেন। ***সন্দীপ সরকার** জন্মেছিলেন এক খৃষ্টান পরিবারে, পড়াশুনো করেছেন রাঁচিতে, বর্তমানে কৃষ্ণনগরে ব্যবসা করেন। ***সুভাষকুমার মিত্র** স্কটিশ চার্চ কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র।

কবিতাভবন, ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ২৯ থেকে প্রকাশিত ও ১৪১ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-১৩ মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং হাউস প্রাইভেট লিমিটেড-এ মুদ্রিত।
সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রক : বুদ্ধদেব বসু। সহকারী সম্পাদক: নরেশ গুহ।

KAVITA

(Poetry)

Vol. **22**, *No.* **3**

Yearly Rs. 4/-, or 6s. 6d. or $ 1. 50
Rupee one per copy

এক টাকা

Published quarterly at Kavitabhavan, 202 Rashbehari Avenue, Calcutta 29, India

Editor & Publisher : BUDDHADEVA BOSE